BHAMA

and other stories

Copyrighted

Material

ভামা ও

অন্যান্য গল্প

গার্গী ভট্টাচার্য

উৎসর্গ:::

আমার ইচ্ছেগুলোকে

এই বইয়ের সব চরিত্র কাল্পনিক । কোনো দেশ, জাতি ও সমাজের সাথে কোনো মিল নেই । যদি কোনো মিল কেউ খুঁজে পায় তা নিছকই কাকতলীয় ।

কোনো ধর্ম, জাতি , বর্ণ অথবা দেশকে নীচু করার জন্য এই গল্প রচিত হয়নি ।

পাঠকদের নেহাৎ-ই আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে এই ভিন্নস্বাদের

গল্প লেখা হল । আশাকরি কাউকে আমরা আঘাত করছি না ।

ভামা

আধা ভারতীয় আধা সাহেব মেয়ে , ভামা ঠাকুরির স্বামী তাকে বিয়ে করেছিলো ভালোবেসে । ট্রেক করতে গিয়ে দেখা হিমালয়ের এক দূর্গম বনপথে । বসন্তে সেই পথ ফুলেফুলে ঢাকা হলেও শীতে চারিপাশে বরফ ।সেই বরফে বসেই তাকে আগুনের লেলিহান শিখার সামনে প্রপোজ করে হিমল ঠাকুরি । পাহাড়ি পুরুষ কিন্তু বলে , আমি তেমন রাফ অ্যান্ড টাফ নই । আমার মগজ বেশি চলে । দেহে রাজরক্ত থাকলেও আমি চিন্তাশীল মানুষ ।

তা বটে । খুবই চলে মগজাস্ত্র । যাকে বলে ব্রেন পাওয়ার । ব্রেন স্টর্মিং করতেই বেশি পছন্দ করে হিমল । হিমের দেশের কালপুরুষ !

অত্যন্ত উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী হিমল । জীব বিজ্ঞানী ।

এক অভিনব বস্তু আবিষ্কার করেছে সে । আধুনিক মানুষের কাছে কর্কট রোগ এক ভয়ের বস্তু । কিন্তু জিনিয়াসেরা এইসব ভয় ভ্রান্তিকেই নতুন ভাবে কাজে লাগিয়ে মানুষের উপকার করতে পারেন । তারা যে কোনো জিনিসের অন্য মাত্রা বা ছন্দ দেখতে পান কাজেই সেইভাবেই হিমল ক্যান্সারকে মানুষের ভালোর জন্য কাজে লাগায় । ঠিক ক্যান্সারের মতনই একটি নকল টিউমার জৈবিক উপায়ে সৃষ্টি করে সে মানুষের দেহে জুড়ে দিতো । সেই নকল টিউমারটি প্রচুর পরিমানে শর্করা শোষণ করে নিতো । এইভাবে অতিকায় মানুষ অতি সহজেই ওজন কমিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠতো । আধুনিক যুগে জাঙ্ক ফুড খাওয়া , নড়াচড়া না করা , সারাদিন কম্পিউটার ও টিভির সামনে বসা , অতিরিক্ত অফিসে কাজ করা ও হাঁটাচলা কমে যাওয়াতে মানুষের মধ্যে ওজনগত সমস্যা প্রায় মহামারির আকার নিয়েছে বিশেষ করে পশ্চিম দেশে । ওদের দেশের মোটা আর এশিয়ার মোটার মধ্যে মোটা রকমের ফারাক । ১০০/১৫০ কিলো ওজন ওখানে কিছুই নয় ।

কাজেই হিমলের আবিষ্কার দুনিয়ায় ঝড় তোলে । নামডাক হয় ।

ওজন কমে গেলে লোকে এই নকল টিউমার শরীর থেকে কেটে ফেলে দেয় । আজকাল আর পৃথুলা রমণীদের মিস্ ইউনিভার্স হতে বাধা নেই তেমন । হিমল বেশ কেউকেটা হয়ে উঠেছে । তবে বিজ্ঞানীরা চিরটাকালই মিডিয়াকে একটু এড়িয়ে চলে । ওরা বেশি খবরের শিরোনামে থাকা পছন্দ করেনা । ওদের মধ্যে এইধরণের জিনিসগুলি কাজ করার জন্য বাধার সৃষ্টি করে বলেই ধরা হয় আর হিমল খুবই মুখচোরা গোছের মানুষ তাই মিডিয়াকে একটু এড়িয়েই চলে । নেহাৎ-ই ভালোমানুষ , গোবেচারা । আজকালকার জগতেও তার হৃদয়ে সততা, স্বচ্ছতা এইসব শব্দ বাস করে । ঝঙ্কৃত হয় সরলতার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ।

প্রণয় ঘটিত বিবাহ হলেও ঠিক এই কারণেই যেন ভামা ওকে ১০০ ভাগ ভালোবাসতে পারেনি । সমাজে ইন্তেলেক্‌চুয়ালদের দৌড় ও মুরোদ তার দেখা আছে । আর ওর বর নিপাট ভালোমানুষ । ঝড় দেখলে ছুটে পালায় । এহেন মানব সন্তান ভামার কাছে খুব একটা গ্রহনীয় নয় । কিন্তু কমবয়সের মন দেওয়া নেওয়া সবকিছু মেপে হয়না ।

আচ্ছা কোনো মানুষই কি কাউকে ১০০ ভাগ ভালোবাসতে পারে ? মনে হয়না । সবারই হৃদয়ে ফুটো থাকে । কেউ ভীতু তাই বলেনা । কেউ বোঝেনা । কেউ হয়ত সারাটা জীবন খুঁজেও ছিদ্র বার করতে পারেনা তাই অতৃপ্ত থেকে যায় আর কেউবা তোয়াক্‌কা করেনা ।

ভামা কিন্তু জানে ওর এই আংশিক অতৃপ্তির কথা । হয়ত ওর স্বামীও বোঝে । বুদ্ধিমান মানুষ । আচার ব্যবহার থেকে কি কিছুই টের পায় না ? কিন্তু প্রকৃত ইন্তেলেক্‌চুয়াল । বেশি ঝামেলায় যেতে নারাজ ।

তাও আবার স্ত্রী ঘটিত মামলায় তো একেবারেই নয় ।

ভামার আরেকটি ইতিহাস আছে বটে। সেটাও হিমলের অজানা নয় ।

তবুও হিমল ওকে ছেড়ে যায়না !

ভামা এক পতিতার কন্যা । ওর মা ফিরোজাবাদের এক কাঁচের চুড়ি ব্যবসায়ির কন্যা ছিলো । একেবারে মধুবালা কিংবা সায়রা বানো নাহলেও ওর মাকে দেখতে ভালো ছিলো । অপূর্ব ছিলো তার গায়ের রং । একেবারে গোলাপি । তার সাথে মোলায়েম ত্বক । আর একরাশ মেঘের মতন চুল । মাত্র নয় বছর বয়সে তার মায়ের বিয়ে হয়ে যায় । কিন্তু তার স্বামীর বয়স ছিলো প্রায় আশি । খুব অল্প বয়সে বিধবা হবার পরে তাকে

স্বামীর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় সম্পত্তি সংক্রান্ত কারণে । কিশোরী মাকে এরপরে কেউ কোনো গণিকালয়ে পাচার করে দেয় । দিল্লী শহরের কাছে ; বলা ভালো বিমান বন্দরের কাছে এই গণিকালয়ে অনেক সাহেব আসতো । সেখানে তার পিতা উল্‌ফ থর্প কয়েকবার গিয়েছিলো । আলাপ হয় সদ্য নিয়ে আসা সেই মেয়েটির সাথে । হিন্দীতে বলে, নথ উতারনা । সেই নথ উতরিয়েই চলে যায় ভামার বাবা আর কথা দিয়ে যায় যে এই নরক থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে । কিন্তু সেইসময় তো এত ইমেল, ফেসবুক, সুপার সোনিক জেট ছিলোনা । কাজেই ফিরে আসা সহজ হয়নি । মায়ের গর্ভে ছোট্ট ভামাকে রেখে উল্‌ফ সেই যে চলে গেলো আর ফেরেনি, মায়ের বেঁচে থাকাকালীন। ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে মা । একটিমাত্র গ্রাহকই ছিলো তার । শরীর মন ভীষণ ভেঙে পড়ে এই ঘটনার পরে । তখনকার দিনে পতিতা পল্লীতেও হয়ত মানবিকতার স্পর্শ ছিলো । তাই এই অভাগিনীকে কেউ জোর করেনি । সন্তান জন্ম দিয়ে অবসাদ রোগে আক্রান্ত মেয়েটি অনেকটাই শীতল বরফের মতন হয়ে যায় । ইংরিজিতে যাকে বলে ফ্রিজিড্‌ । পতিতা পল্লীর খুব্জা মাসী হয়ত ভেবেছিলো , জিন্দা লাশকে আর মেরে হবেই বা কি ?

তাই মাকে আর কোনো গ্রাহকে গ্রহণ করতে হয়নি । মা আর বেশিদিন বাঁচেওনি । লম্বা বারান্দার শেষে, মেঝেতে বসে পথপানে চেয়ে থাকতো যদি সেই সাহেব আসে। অন্য কোনো গোরা চামড়া এলে ছুট্টে যেতো। জানতে চাইতো উল্‌ফকে সে চেনে কিনা । কিন্তু কেউ আসেনি শেষ অবধি । শিশু ভামাকে রেখেই একদিন সে চলে যায় ।

তার বাবা উল্‌ফ কিন্তু গিয়েছিলো সেখানে । কিন্তু ততদিনে মা দেহ রেখেছে । তাই শিশু ভামাকে নিয়ে চলে আসে হিমালয়ের ছোট্ট এক পাহাড়ি শহরে । সেখানেই বেড়ে ওঠে ভামা থর্প । ভামা নামটা তার

মায়ের দেওয়া নাম । মা নাকি এইনাম দিয়েছিলো এই কারণে যে আমরা যে মেয়ে সেটা আমাদের চেহারা , ছবি কেবল নয় নামেও প্রকট হোক্ । লোকে জানুক আমরা দূর্বল কোনো জীব নই আমরা শক্তির অংশ । আমরা ভামা !

তা ভামা সত্যি শক্তির অংশই । ওর বাবা **ভাইকিং-দের** বংশধর । যাদের সারাদুনিয়ায় লোকে বীর ও সাহসী বলেই জানে । আগে ওদের লোকে জলদস্যু বলে অভিহিত করলেও ইতিহাস নিয়ে যারা চর্চা করে তারা বলে যে ওরা অত্যন্ত বীর ও যোদ্ধা প্রকৃতির মানুষ । দূরদূরান্তে গিয়ে নিজেদের বসতি গড়ে তোলা , সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে গভীর বনে, নির্জন মরুপ্রান্তে শিবির ফেলা কিংবা উত্তাল মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি দিয়ে অজানাকে জানার জন্য তাদের নাম ।

সেই ভাইকিং পিতার রক্ত তার দেহে কাজেই বীর ও যোদ্ধা মানুষের প্রতি তার তো একটু বাড়তি আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিকই । আর সে নিজেকে মেয়ে বলে ভাবেনা । মানুষ বলে ভাবে ।

তার বাবা তাকে যথাযথ লেখাপড়া শেখালেও সে কাজ করে খুব অদ্ভুত । লোকে জানে তার মা রয়ে গেছে সুদূর বিদেশে । তার চোখ সবুজ আর গায়ের রং বাবার মতন কমলা । স্বর্ণকেশী । তাই লোকে সন্দেহ করেনা যে তার মা ভারতীয় হতেও পারে ।

বাবা তাকে কলেজেও পড়িয়েছে । সে মিশনারি স্কুল ও কলেজে পড়েছে । বায়োলজি নিয়ে বিএস-সি করেছে । তার মেজর ছিলো জুলজিতে । জীববিজ্ঞান তার ভালোলাগতো । কিন্তু কাজটা তার খুব অদ্ভুত । সে ঘাপ নামক এক জন্তুর বিষ সংগ্রহ করে ।

ঘাপ হল সরীসৃপ । সাপের মতন দেখতে তবে একটু অন্যজাতের ।

লম্বা , গায়ে শঙ্খের ধারে যে থাকে সেরকম সরু মতন, লম্বা লম্বা কি বলা যায় শূর কি ? হয়ত তাই নাকি প্রজেকশান? আর ছুঁচুলো একটি মুখ । সেই মুখ দিয়ে রেগে গিয়ে সে এক মিনিট পরে বিষ ছুঁড়ে দেয় । এই বিষ সংগ্রহ করে ভামা । বিষটি মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক । একটু ছুঁলেই মরণ হবে । কিন্তু সেই বিষ প্রসেস করে ওষুধ কোম্পানিগুলি এমন এমন সমস্ত ফার্মাসিউটিক্যাল পিলস্ তৈরি করে যা মানুষ ও পশুদের জীবন বাঁচানোর জন্য খুবই প্রয়োজন । ভামা তাই খুবই ভালো মাইনে পায় । শুনতে মনে হয় খুব সোজা । এই ঘাপ বিষ ছাড়লো আর এই আমি প্লাস্টিকের ব্যাগে পুড়ে ফেললাম ! কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয় আদৌ !যখন রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ও বিষ ছোঁড়ে , তার আগে একমিনিট গুনে অপেক্ষা করা ও নিজের ইন্টিউশনের ওপরে নির্ভর করে ওর মুখে বেশ বড় সাইজের একটি বিশেষ প্লাস্টিকের ব্যাগ ধরা যথেষ্ট দক্ষতা ও সাহসের পরিচয় দেয় । এর জন্য বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয় । এই ঘাপ একমাত্র পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়া দেশে । অস্ট্রেলিয়া পোকামাকড়ের দেশ ।

আজব সমস্ত জীবজন্তু এখানে দেখা যায় । হেন কোনো মাকড়সা নেই যা এখানে দেখা যায়না । কাজেই ঘাপ যে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে তাতে আশ্চর্য কি ?

ভামা তো এখন অস্ট্রেলিয়াতেই আছে হিমলের সাথে । হিমলের নিজের দেশে তো ক্যান্সারের নকল আবের সেই গবেষণার তেমন সুযোগ সে পায়নি । অনেকে ঐ আবিষ্কার নিয়ে রাজনীতি করেছে , অনেকে নিজের

নামে করে নিতে চেয়েছে , অনেক লোক বিদ্রূপ করেছে , অনেকে আবার ওকে উন্মাদ বলে অ্যাসাইলামে যেতে উপদেশ দিয়েছে । অনেকে এও বলেছে , আমাদের পার্টিতে নাম লেখাও, চাঁদা দাও সব হয়ে যাবে ।

তাই ওরা অন্য দেশে চলে এসেছে । এখানে ওরা ভালই আছে । লোকজন কম । শান্তি আছে । আর আছে আজব সরীসৃপ ঘাপ ।

ওকে লোকে ব্রেভ লেডি বলে অভিহিত করে ।

লোকাল কাউন্সিল থেকে ওকে পুরস্কারও দিয়েছে এমন সাহসের কাজ করার জন্য । ওর বর হিমল অবশ্যি বলে , তুমি সাহসী নও, দু:সাহসী ।

এহেন ভামার জীবনের মোড় ঘুরে গেলো একদিন খবরের কাগজে একটি দু:সংবাদ পড়ে ।

একদিন সকালে শীতের রোদ মেখে সে নিউজিল্যান্ডের মাওড়ি আদিবাসীদের চা (লেমনগ্রাস , আদা দিয়ে তৈরি) পান করছিলো । এখন তো বিশ্বের নানান জায়গায় হঠাৎ করে বরফ পড়ে । ওদের বাড়ির কাছে আগে স্নো পড়তো না । এখন পড়ছে বেশ কিছু বছর ধরে । একদিন এমন স্নো হল যে কাউন্সিল থেকে লোক এসে স্নো সরালো । ওর বাসার কাছে একটি গ্রাম আছে । সেখানে একজন অস্ট্রেলিয়ান লেখিকা জন্মেছিলেন । মাইলস্ ফ্রাঙ্কলিন্ নাম । তার নামে বড় প্রাইজ আছে । মাইলস্ ফ্রাঙ্কলিন্ অ্যাওয়ার্ড । অস্ট্রেলিয়ার সবথেকে বড় সাহিত্য পুরস্কার । পাহাড়ি গ্রামটি ভারি সুন্দর ।

সেদিন ও হাল্কা বরফের সামনে বসে চা পান করতে করতে পড়লো যে ইরাজ দেশের ডাকসাইটে জেনেরাল শিরাক মেহেলানিকে আমেরিকার থেকেও এগোনো দেশ অর্থাৎ দুনিয়ার প্রথম দেশ বলে যাকে এখন মানা হয় সেই দেশ গ্রীম , স্যাটেলাইট থেকে স্পেস্ টু সার্ফেস মিসাইল ছুড়ে মেরে দিয়েছে । এইজাতের মিসাইল যে হতে পারে কেউ জানতো না । স্পেস থেকে এই মিসাইল ছোঁড়া তো দূরস্ত ! পৃথিবীর বায়ুমন্ডলকে ভেদ করে যেমন উল্কা আসে, সেরকম নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে এই জাতের মিসাইল বানিয়ে গ্রীম, সবার চোখের আড়ালে বসে, ভূখন্ডের বাইরে ভাসমান উপগ্রহ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে শিরাক মেহেলানিকে এক সেকেন্ডের মধ্যে বাতাসে মিলিয়ে দিয়েছে । এই নব মিসাইলের নাম **অ্যান্টাই স্কেলেটন** । (Anti-Skeleton)

-**বুম্ , অ্যান্ড হি ইজ গন** । বলেছেন ওদের রাষ্ট্রনেতা ফ্রেডো লার।

শিরাক ওয়াজ আ টেররিস্ট । নাও দা ওয়ার্ল্ড উড বি আ বেটার প্লেস । ইট উড্ বি আ বেটার প্লেস ফর দা এন্টায়ার হিউমান রেস ।

--টুকরো টুকরো হয়ে গেছে জেনেরাল মেহেলানির দেহ ! চারড্ রিমেন্স অফ- দা জেনেরাল ।

--- দেয়ার ওয়ার অনলি হিজ বিগ রিং ,সুজ্ অ্যান্ড ব্রোকেন মোবাইল স্ক্যাটার্ড হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার।

বড় বড় ছবি দেখেছে আন্তর্জালে , খবরের কাগজে , টিভিতে ।

ইরাজি জেনেরাল ইন বিটস্ অ্যান্ড পিসেস ।

বিরোধীরা সোসাল মিডিয়ায় লিখেছে যে নরকে বসে শয়তান এখন শিরাকের কাবাব খাচ্ছে লেবু ও পেঁয়াজ সহযোগে ।

শিরাক নাকি অনেক উগ্রবাদী দলের নেতাদের চালিত করতেন ।

কিন্তু ভদ্রলোকের নিজের দেশ ইরাজে তাঁকে বীরের সম্মান দেওয়া হয় । তাই খুব অবাক হয় ভামা । সারাবিশ্ব যাকে উগ্রপন্থী বলছে, তার মৃত্যুতে উল্লাস করছে তাকে নিজ দেশে এবং তাদের কিছু বন্ধু দেশে বীরের সম্মান দেওয়া হচ্ছে? অদ্ভুত কান্ড !

আর উগ্রপন্থীদের দেহ তো মহাসমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হয় । তাদের যাতে করে কেউ শহীদ ঘোষণা করে সমাধিতে পুষ্পস্তবক না দিতে পারে সেই কারণে কিন্তু এনার ক্ষেত্রে এঁর দেহ ইরাজ দেশের হাতেই তুলে দেওয়া হল।

এতদিন জানতো সব ঘটনারই দুটি দিক হয় । কিন্তু এখন মনে হচ্ছে দুটি নয় অজস্র দিক হয় । খুবই উৎসাহিত হয় ভামা । যাক্ এতদিন পরে একজন সত্যিকারের বীরপুরুষের খোঁজ পেলো সে ! একা লড়াই করে নিজের দেশকে রক্ষা করছিলো যে । এখন প্রশ্ন হল সে টেররিস্ট কিনা ! সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য । কিন্তু তার জন্য ভামাকে যেতে হবে ওদের দেশে । যেখানে শিরাক মেহেলানির টুকরো টুকরো দেহ শায়িত রয়েছে একটি গোলাপ কাঠের বাক্সে ! ওদের দেশের এটাই রীতি ।

পাহাড়ের গায়ে গোলাপ কাঠের বাক্সে ঝোলানো থাকে বীরদের মৃতদেহ । ওপরে সাজানো থাকে তাদের ব্যবহৃত নানান বস্তু । আদতে প্রিয় বস্তু । এনার ক্ষেত্রে --হাতে লেখা ডাইরি, একটি বিরাট সোনার আংটি প্রবাল বসানো আর একটি **হোল্লা নবী রূপচাঁদামাচের** ছবি । গোলাপ কাঠের

বাক্সে কিন্তু পুরো দেহটি থাকেনা সেটা পরে জানা গেলো । থাকে আদতে চিতাভস্ম । আর বাক্সের ওপরে প্রিয় জিনিসের সাথে একটি গোলাকৃতি পাত্রে রাখা থাকে কিছুটা চিতাভস্ম প্রয়োজনে কাউকে দেবার জন্য ।

হিমল খুবই নরম প্রকৃতির মানুষ । ভামা পুরো জিনিসটা তার সাথে আলোচনা করলো । সে বলে উঠলো , আরে এইসব উচ্চস্তরের ব্যাপার , হাইলি পলিটিক্যাল ঘটনা । আমরা সাধারণ মানুষেরা কোনোদিন কিছু জানতে পারবো না আর ওরাও আমাদের কিছু জানাবে না ।

অনেকদিন পরে হিমল ওর নেপালী টুপিটা পরেছে । টুপিটা খুবই অদ্ভুত তবে ভামার ভালোলাগে আর হিমলকে ভালো দেখাও ।

ভামা বলে, একটা কুক্‌রিও রাখতে পারো, আত্মরক্ষার জন্য । বলা কি যায় !

হিমল হেসে বলে , আরে আমি গরীব বিজ্ঞানী আমাকে কে কি করবে ? ভামাও জোরে জোরে হেসে ওঠে ।

আজ ভামা রান্না করেছে । আজকাল ওরা আর বাসায় রান্না করেনা ।

দোকানে সবই কিনতে পাওয়া যায় । হেল্‌থ্‌ ফুড । ক্যালরি মাপা ভালো খাবার । তবে আজকে কি মনে হল ভামা রান্না করেছে । চিলি চিকেন আর লেবানিজ ব্রেড । ব্রেড্‌টা কিনে এনেছে । লেবানিজ ব্রেড ভামার খুব প্রিয় । দূর্দান্ত লাগে । গন্ধটাই দারুণ । আর চিলি চিকেনে একটু অবশ্য ফাঁকি দিয়েছে । ম্যাকডোনাল্ড থেকে চিকেন নাগেট্‌স কিনে এনে সেটা দিয়ে চিলি চিকেন বানিয়ে নিয়েছে ।

খেতে খেতে প্রসঙ্গ তুললো । বললো , আমি নিজে গিয়ে দেখতে চাই ব্যাপারটা কি !

প্রায় চমকে উঠে বিষম খেতে গিয়ে হিমল বলে, তোমার মাথায় গোলমাল আছে জানতাম কিন্তু একদম বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছো আগে তো বুঝিনি !

ওখানে গিয়ে তুমি কি করবে ? লোকটা টেররিস্ট হলেই বা কি, নাহলেই বা কি ? ও না আমাদের কোনো আত্মীয়, না আমাদের দেশ বা প্রতিবেশী দেশের লোক আর না অস্ট্রেলিয়া ওকে মেরেছে । তুমি গিয়ে করবেটা কি ? সাংবাদিকতা শুরু করবে নাকি , ঘাপ থেকে ছাপ মানে ছাপাছাপি ?

একটু মেকি হাসি দিলো ভামা। ভামাকেও দেখতে ভালো । আর দেখতে ভালো মেয়েদের তো পুরুষেরা পছন্দ করেই, জাতকূলশীল তত দেখেনা । আজকে ভামা ভালো করে সেজেছেও । পুরুষের আদিম প্রবৃত্তি!

গাঢ় রং এর মোটা কাপড়ের কাফতান , গলায় মাফলার -- চুলটা লুজ করে বাঁধা । বাঁ হাতে মোটা রূপার ভাইকিং ব্রেসলেট যা ওর শিকড়ের কথা মনে করায় আর কানে ওপালের দুল, রোজ গোল্ডে মোড়া । ওপাল ওর প্রিয় পাথর । সোনার থেকে রূপা বেশি পছন্দ করে। বিয়েতে সমস্ত গয়না নিয়েছিলো তামার । বৌভাতে বা রিসেপ্শানে পরেছিলো পুঁথির গয়না । কিন্তু গয়নার কারুকার্য ও নক্শা এত্তো সুন্দর যে লোকে তারিফ করে করেও পারছিলো না ।

আজও দেখা হলে সেই কথাই বলে । ও বলে, সাজতে জানতে হয় ।

গাদা গাদা দামী জিনিস পরলেই কেউ সুন্দর হয়না ।

ও সেমি প্রেসাস স্টোন ভালোবাসে আর হিরে, পান্না, চূণী একেবারে পছন্দ করেনা ।

ওকে আমরা রূপসী বলবো না, বলবো অত্যন্ত মিষ্টি।

এতক্ষণে খাওয়া শেষে ওরা ফায়ার প্লেসের কাছে এসে বসেছে । ইলেকট্রিক হিটার ব্যাতীত ওদের লিভিং রুমে বিরাট একটা ফায়ার প্লেস আছে । সেখানে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হয় । ডিনারের পরে কফি খেতে খেতে বসে বসে ওরা শেঁকে নেয় নিজেদের , শীতের সন্ধ্যায় শুতে যাবার আগে । ওরা ক্যানবেরায় থাকে । এখানে অসম্ভব ঠান্ডা পড়ে । সাব জিরো কিছু না । মাইনাস্ তাপমাত্রা খুবই স্বাভাবিক আর ইদানিং তো স্নো পর্যন্ত হচ্ছে !

তো সুশ্রী ভামার দিকে চেয়ে হিমল বললো , আমাকে তুমি এত্তো কম বয়সে বিপত্নীক করতে চাও কেন ? জানো ওসব দেশ কত রক্ষণশীল ? এসব ট্রাউজার, জিন্স, টপ্ ,স্কার্ট পরে ওখানে গেলে তোমাকে জেলে পুরে দেবে । ওখানে যেতে হলে তোমাকে মাথা ঢেকে , পা ঢেকে যেতে হবে । নাহেল মেরেও ফেলতে পারে ।

--তা যাবো , বলে ওঠে ভামা । যস্মিন দেশে যদাচার । ওটা ওদের কালচার । আমার কোনো অসুবিধা নেই তাতে । আমি তোমাকে সবটুকু দেখিয়েই খুশি আর কাউকে প্রয়োজন নেই ।

--তবে আমার মনে হয় ওরা মেয়েদের কন্ট্রোল করে । কন্ট্রোল ফ্রিক্ । মেয়েদের কাছে ওদের চাহিদা অনেক।পুরুষেরা কতটা কি করে জানি না ।

ভামা বলে ওঠে, সেগুলো জানতেই যাবো । তাছাড়া শুনেছি ঐদেশ ভারি সুন্দর । ওদের ইতিহাস সুন্দর । একবার দেখে আসবো ।

গ্রীম দেশের নেতা যে বলেছেন ওদের সমস্ত ঐতিহাসিক স্থল গুঁড়িয়ে দেবেন সেটা খুবই আজব কথা । মনুমেন্ট, স্থাপত্য , শৈল্পিক মহল

এসব তো সারা দুনিয়ার মানুষের জিনিস-- এগুলো কি কোনো জাতি বা একটিমাত্র দেশের জিনিস নাকি ? এগুলো তো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকে । মানব জীবনের হাসিকান্নার শীলমোহর বুকে নিয়ে এগুলো বয়ে চলে --এইভাবে ধ্বংস করে দেওয়া তো খুবই শিশুসুলভ মনের পরিচয় । দুনিয়ার এক নম্বর দেশ বলে যাকে সবাই মানে, সেই গ্রীমের এক নম্বর নাগরিকের কাছ থেকে এইজাতীয় উক্তি সত্যি আমাদের ভাবায়, আমরা কি এগোচ্ছি ??

অনেক জল্পনা কল্পনার পরে, অনেক জিনিস ট্যুরিস্ট কোম্পানি থেকে শিখে পড়ে নিয়ে -শেষে এসে হাজির হয় ভামা তার স্বপের দেশ ইরাজে । তার আর হিমলের কোনো সন্তান নেই । তার মনে হয় এই স্বার্থপর জগতে কোনো বাচ্চাকাচ্চা না রেখে যাওয়াই ভালো । শান্তিতে মরতে পারবে না ! তাই ওরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে । বেড়ায় , সোস্যাল ওয়ার্ক করে , নতুন নতুন জিনিস শেখে এইভাবেই দিন কেটে যায় । নানান শখ আছে । সেসব মেটায় । তবু কি শুধু দেশ দেখতেই আসা? নাহ্ !

যে কথাটা হিমলকে বলা হয়নি বা বলা হবেও না কোনোদিন তা হল ; ভামার হৃদয়ে যে ফুটো আছে তা রিফু করতেই সে এইদেশে হঠাৎ পাড়ি জমিয়েছে । শিরাক মেহেলানির ছবি দেখেই তার মনে হয়েছে যে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মের , ভিন্ন সংস্কৃতির এই বীর মানুষটি যাকে লোকে আজ সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়েছে সে কোনো না কোনো ভাবে তার সাথে জড়িত । কোনো কোনো জন্মে সে ভামার খুব কাছের কেউ ছিলো । ওনার প্রতিটি

ছবি ভামার কাছে জীবন্ত । নয়নের দৃষ্টি যে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করছে তাকে ! অথচ তিনমাস আগেও এর নাম জানতো না । এমনও হয় ?

স্পর্শ না করেও ছোঁয়া যায় কাউকে ? মরে গিয়েও এত পূর্ণিমায় ডোবানো যায় ? এ যেন চাঁদের শব্দকেও হার মানাবে ।

ইনি হলেন কেউ-- অর্থাৎ এমন কেউ যিনি তার এইজন্মের হৃদয়ের ছিদ্রটি রিফু করে দিতে পারেন । তাই সে এখানে শত বাধা সত্ত্বেও ছুটে এসেছে । এসব দেশে আসা পশ্চিম দেশ থেকে খুব সহজ নয় । বিশেষ করে এরা পশ্চিমীদের পাসপোর্ট নিয়ে রেখে দেয়। অনেক সময় দেয়না ।অনেক সমস্যা হয় । অনেক অনেক সমস্যা হতে পারে । অনেক সময় তাদের চর বলে জেলে আটকে রাখে । এবং যে সে জেলে নয়, কুখ্যাত সব জেলে । নটোরিয়াস কয়েদীদের সাথে রেখে ; বিনা দোষে প্রচন্ড অত্যাচার করা হয় তাদের কেবল কোনো পশ্চিম দেশের নাগরিক বলে । তবু ভামা এসেছে । সে তো ভাইকিং এর বংশধর! বাবা বেঁচে থাকলে হয়ত বলতেন- যাও ।

আর বাবাও তো গিয়েছিলো মা কে বাঁচাতে । ঐ নরক থেকে ।

সবাই এত ভয় পেলে সমাজ এগোবে ? মরে গেলেও যাবে । আত্মা কি মরে ? আবার জন্মাবে । আবার নতুন দেহ নিয়ে আসবে । নতুন সংকল্প । নতুন মন । নতুন সমাজ । আর শিরাক মেহেলানির বেগম সাহেবা ।এত্তো সাহসী মানুষ ! একা হাতে যুদ্ধ করতেন কোনো আধুনিক বর্ম ছাড়াই । ছাত্রদের শেখান , মৃত্যুই শেষ নয় । মৃত্যু থেকে শুরু । দা বডি অনলি ডাইজ্ ।

যা হিন্দুদের গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছেন । মানুষ আদতে অমর ।

শিরাক বলতেন ;

বীরেরা মারা যায় না । তারা দেহ রাখে । আবার নতুন দেহ নিয়ে আসে । দুষ্টের কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করতে ।নারীরাই পারে এসব বীরেদের জন্ম দিতে। তারা মহীয়সী । রত্নগর্ভা । তারা পূজনীয়া ।

এদেশের পুরুষেরা নাকি কন্ট্রোল ফ্রিক ? হিমল বলছিলো না ?

অসাধারণ বক্তা ছিলেন উনি । অথচ শিক্ষা স্কুল ড্রপ আউট । বক্তৃতা শুনলে নাকি গায়ে কাঁটা দিতো । কোনো ধর্মীয় বচন নয় । ওদের ধর্ম হল প্রকৃতি আর যা কিছু প্রাকৃত ।

বলতেন -- যদি পড়ুয়া পন্ডিতদের আমার শিবিরে আনো আমি সাতদিন লেকচার দিয়ে ওদের শিরদাঁড়া এমন সোজা করে দেবো যে ওরা আটদিনের মাথায় এক্সপ্লোসিভ হ্যান্ডেল করার মতন সাহস সঞ্চয় করে ফেলবে ও দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে কলম ছেড়ে ক্যালাশ্নিকভ ধরবে ।

ইরাজ একটি উন্নত , স্বনির্ভর ও স্বাধীন দেশ । তাদের দেশ আজ থেকে নয় পশ্চিমের এইসব গ্রীম ,মিহিকা , ফিহিকা দেশের থেকেও অনেক অনেক আগে যখন পাশ্চাত্যের মানুষের পূর্বজরা অর্থাৎ ককেশিয়ান যাদের বলি তারা সভ্যও ছিলো না তখন এই ইরাজের মানুষ বেশ উন্নত ছিলো । তাদের দেশে তখন ছিলো চিনার সভ্যতা । একই নামে এক ধর্মও ছিলো । সেই নামে এক রেশম ও পশমের পোষাকের আমদানিও হতো দুনিয়া জুড়ে । ওদের দেশের নীল পাথরের বাসনপত্র আর গোলাপি

পাথরের ঘরবাড়ি , সবুজ পাথরের অফিস কাছাড়ি জগৎ বিখ্যাত । এছাড়া দেশটির মেয়েরা অসামান্যা রূপসী । গোলাপের মতন রং তাদের । সুন্দর মুখশ্রী । চোখা নাক । টানাটানা দুই চোখ ।

ওদের দেশে এখন নতুন এক ধর্ম আছে । নাম হোল্লা । এই হোল্লা ধর্মের প্রতিষ্ঠতা হলেন এক নবী- রূপচাঁদামাচ । উনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ । তার থেকে শুরু হয় এই নব ধর্ম যা প্রকৃতিকে পুজো করে । রূপচাঁদামাচ, ইরাজ দেশের মানুষই ছিলেন । যখন ওদের রাজপুরুষেরা নিজেদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে দূর্বল মানুষ, শিশু , নারীকূল ও দরিদ্রদের ওপর অত্যাচার শুরু করে তখন এই নবধর্মের সূচনা হয় ।

এই ধর্মে কোনো মূর্তি পুজো নেই । নেই কোনো দেবতা । রূপচাঁদামাচ দেখিয়ে গেছেন যে মানুষই আসলে দেবতা । তার মধ্যেই অশেষ সম্ভবনা । নবীরা আসেন সেই সম্ভবনাকে দেখিয়ে দিতে । মানুষ দেহ নয় । তার মনও নয় । মানুষ শুদ্ধ চেতনা যা কিনা দেহ চলে গেলেও থাকে এবং তার রূপ হল আমাদের হিন্দুদের শিবলিঙ্গের মতন । কলম অফ্ লাইট । এটাই মহাজগতের রূপ । তারই ওপরে ভাসমান তরঙ্গ হল আমাদের অস্তিত্ব বা ইগো । **যা নিয়ে হলিউডি ছবি আছে ম্যাট্রিক্স ।**

হোল্লা ধর্মে এরপরও অনেক নবী এসেছেন এবং তারাও একই জিনিস শিখিয়েছেন মানুষকে । আরও বলে গেছেন যে মানবের একটাই জীবন নয় । মানব সন্তান শুধু যৌনপিপাসা মেটাবার জন্য জন্ম নেয়না অথবা মেয়েদের পণ্য করাও মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয় ।

তাই ইরাজ দেশ নারী প্রগতির নাম করে নগ্ন নারীদের ছবি দিয়ে পত্রিকার পাতা ভরায় না বা সেক্স লাইফ নিয়ে খোলাখুলি ভাবে জনসমক্ষে আলোচনা করেনা । ওদের মতে এই নিয়ে মতামত দেবার জন্য আছেন

সেক্স চিকিৎসকেরা । এটা মানুষের অত্যন্ত ব্যাক্তিগত ব্যাপার । সবার জানার দরকার নেই । কেউ জানতে চায়ও না । জোর করে এগুলো গেলানো হয় । সংবাদ মাধ্যমে । ফেমিনিজ্‌ম্‌, ফেমিনিজ্‌ম্‌ করে পশ্চিমীরা চীৎকার করে । বলে ইরাজিরা মেয়েদের শোষণ করে । কিন্তু নিজেরা নারীদের নগ্ন করে সমাজে বিকায়/ পণ্য করে বা বার করে । এরচেয়ে বড় অপমান একজন নারীর কিইবা হতে পারে? ফেমিনিজম মানে নারীকে স্বাধীন চিন্তা করতে শেখানো । নগ্ন করে নাচানো নয় ।

ইরাজের পুরুষেরা এসব বলে থাকে ।

তাদের দেশের নারী বিজ্ঞানী , মহাকাশচারী, গীতিকার, লেখিকা , কবি, ফিল্মমেকার এমনকি যোদ্ধার সংখ্যা কিছু কম নয় । কিন্তু সবাই মার্জিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত । পশ্চিমী সভ্যতার ছোঁয়া তাদের জীবনে প্রায় নেই ।

নেশার দ্রব্য, মদ, খোলামেলা পোশাক, উগ্র যৌনতা , সমকামিতা এইসব বস্তু ওখানে নিষিদ্ধ । এটা ওদের জীবন যাপনের রীতিনীতি । অন্যদেশের লোক নাকি এগুলি ওখানে ছড়াতে চায় ।

কিন্তু সমস্যা এখানে নয়। সমস্যার শুরু অন্যত্র ।

এইদেশে প্রচুর পরিমানে দু:স্প্রাপ্য খনিজ দ্রব্য মেলে যা আর কোথাও নেই ইহজগতে। আধুনিক দুনিয়ায় বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ওসব কাজে লাগে । গ্রীম, মিহিকা সহ আরো অনেক দেশ ওদের থেকে এইসব বস্তু কম দামে কিনে অন্য জায়গায় চড়া দামে বিক্রি করে । ওদের দেশে জমির উর্বরতা কম তাই কৃষিকাজ সেরকম হয়না । তাই ব্যবসাই প্রধান জীবিকা । এতে ওদের দেশের উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি হয় । এছাড়া গ্রীম নানান ছলেবলে, কৌশলে ওদের দেশে ঢুকে পুরো দেশটাকে কব্জা করতে চায় যাতে ঐসব খনি নিজেরা দখল করে নিতে পারে । প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার জন্য

দু:স্প্রাপ্য কিছু কিছু খনিজ দ্রব্য কেবল এখানেই মেলে । এছাড়া আছে খ্রিস্টান মিশনারিগণ । তারা ওদের দেশে ঢুকে সবাইকে খ্রিস্টান বানাতে চায় । ওরা নিরাকার ঈশ্বরের পূজারি । সেখানে সাকার ,একদা মানব যিসাসকে ওরা মানতে পারবে না । ওদের দেবতা হল প্রকৃতি ।

ওদের জীবনযাত্রা ভিন্ন । ওরা মেয়েদের বিশেষভাবে দেখে । খোলামেলা ভাবে সমাজে বার হতে দেয়না । ওরা রহস্য ভালোবাসে ।

বিশেষ করে বিবাহিত জীবনে । কাজেই দুই সংস্কৃতির মিল না হওয়াই স্বাভাবিক । ওদের দেশকে, সভ্যতাকে রক্ষা করতেই শিরাক মেহেলানির মতন মানুষেরা জীবন দেন । তাই তাঁরা ওদের কাছে উগ্রপন্থী নন । শহীদ । হয়ত সেইকারণেই জেনেরাল মেহেলানির ছিন্নভিন্ন দেহ নিয়ে কোটি কোটি মানুষ মিছিল করে , বুক চাপড়ে কাঁদে যেন আপন জন চলে গেছে !

সব রাজনৈতিক দলের লোকেরা একত্রিত হয়ে কাঁদছে । বলছে , এ আমাদের জাতীয় ক্ষতি । কেবল কিছু চিনার দলের মানুষ যারা প্রবাসী , তারা বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় বলছে যে **গেট রিড অফ্ দিজ্ হোল্লাজ্ -- উই উইল মেক্ চিনার গ্রেট এগেন ।**

তারা শিরাক মেহেলানির হত্যায় বেজায় খুশি । গ্রীম দেশকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছে । অথচ এই চিনার সভ্যতা ও ধর্ম থাকাকালীন ওদের পুরুষেরা , নারীদের জোর করে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতো । এটা ওদের রীতি ছিলো । তখন নারীরা পর্দানসীন ছিলো । এখন হোল্লা সরকার আইন করে এইসব বন্ধ করে দিয়েছে আর মেয়েরা পর্দার আড়ালে নেই তবে খোলামেলাও নয় । ওরা মাথায় একটা ওড়না রাখে সবসময় । সবাই । বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতা । এমনকি

কিশোরীরাও । এটার কারণ হল, ওরা মহাবিশ্বের কাছে যে কত ক্ষুদ্র সেটা মনে রাখার চেষ্টা করে, মাথাটা মানে ইগোকে ঢেকে রেখে ।।পুরুষেরাও ওখানে মাথায় কাপড় বেঁধে রাখে ।

--কোয়াইট লজিক্যাল, বলে ওঠে হিমল । হিমলের এই লজিক আর ক্ষমাশীল স্বভাবের ঠেলায় ভামার প্রাণ ওষ্ঠাগত । মাঝে মাঝে ওকে বলে, ওহে মারো ; মারো-- গোটা কয়েক চড় থাপ্পড় কষাও লোকেদের ! এত্তো নিরীহ হবার দরকার নেই । লোকে মাড়িয়ে চলে যাবে !

--লজিক না থাকলেই বা কি ? ওদের ভালোলাগে তাই করতেই পারে ! আমার ভালোলাগলে আমি লেবুপাতার মতন সুগন্ধী রোদে স্নান করতেই পারি । তাতে গা না ভিজলেও বা কি ?

লজিক সন্ধানীর মুখে আগুন ।

হিমল তর্ক করেনা আজকাল । গৃহশান্তি বজায় রাখে । মহিলাদের সম্মান দেওয়া ওর একটা কর্তব্য । ও তো প্রকৃত ইন্তেলেকচুয়াল । কাজেই কথা কাটাকাটি হবার আগেই চুপ করে যায় । বিয়ের পরে হতো খুব। তখন ঝগড়া হবার আগেই গায়ে শার্ট চড়িয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে যেতো ।

ইরাজি ডাকসাইটে জেনেরাল যার ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো উনিও ছিলেন অন্তরে খুবই কোমল । কবিতা পড়তেন ও লিখতেন । সেনাদের শিক্ষা দেবার ফাঁকে ছবি আঁকতেন । জল রং ও স্কেচ । এবং নিয়মিত ওদের যা ধর্মীয় অর্চনা অর্থাৎ প্রকৃতির পুজো সেগুলো করতেন অর্থাৎ বিশেষ উপায়ে ওদের নবীদের শেখানো ধ্যান । যতই ব্যস্ত হোননা

কেন দুপুর হলে, ভোজন সেরে হাত ধুয়ে উনি ধ্যানে বসে যেতেন অন্তত: পনেরো মিনিট কিংবা আধঘন্টা ।

কথা বলতেন খুবই কম এবং কেউ ওনাকে কোনোদিন উঁচু গলায় কথা বলতে দেখেনি । কোনো সৈন্য নিহত হলে তার বাড়ি গিয়ে দেখা করতেন । প্রতিটি যোদ্ধাকে বুকে জড়িয়ে ধরে যুদ্ধে পাঠাতেন । অর্থাৎ উনি ছিলেন খুব স্পর্শকাতর মানুষ অথচ বাইরে পাথরের মতন কঠিন ও দায়িত্ববান । তাঁর ওপরে ছিলো ইরাজ দেশের সুরক্ষার ভার । সেই কাজ জীবন দিয়ে করে গেছেন । এত ক্ষমতাশালী, ক্ষমাশীল ও নিজের কাজের প্রতি প্যাশন খুব মানুষের মধ্যে দেখা যায় ।

গ্রীম দেশ তাকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিলেও, ইরাজি মানুষ বলে থাকে যে গ্রীমিরাই দু:স্প্রাপ্য খনিজের সন্ধানে ওখানে গিয়ে ওদের সমাজ ব্যবস্থা , ধর্ম ও অর্থনীতির ওপরে দাদাগিরি করতে চাইছে অথচ উগ্রবাদী বলছে তাদের সেনানীদের যারা নিজের দেশকে রক্ষা করার ব্রত নিয়েছে । ইরাজিরা কোনো দেশে গিয়ে হামলা করেনি । ওদের সাহস ও যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখে প্রতিবেশী অনেক ছোটখাটো দেশ ওদের সাহায্য নিয়েছে নিজেদের গ্রীমিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য । গ্রীমিরা নাকি সত্যিকারের উগ্রবাদীদের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে ও সন্ত্রাসবাদ জিইয়ে রাখে এলাকায় , অশান্তি যাতে চিরস্থায়ী হয় । শিশুরা খেতে পায়না , লোকালয় এর পর লোকালয় বোমাবাজিতে বিধবস্ত কিন্তু গ্রীমি সেনারা ওখানে তলে তলে উগ্রপন্থা টিঁকিয়ে রাখে ; ওসব দলকে মারণাস্ত্রের যোগান দিয়ে । এটা নাকি একজাতের ব্যবসা । লড়াই থেমে গেলে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ চলবে কী করে ?

আর আমেরিকাও গ্রীমিদের শাসিয়েছে । কিন্তু ওরা কারো কথা শোনার বান্দা নয় । মজার ব্যাপার হল গ্রীম দেশ কমিউনিস্ট দেশ । ওরা কোনো অফিসিয়াল ধর্ম মানেনা কিন্তু ওখানে মানুষজন সবাই খ্রীস্টধর্ম মেনে চলে । তারা আবার মিশনারি হয়ে ঢুকে পড়ছে আর সবাইকে বোঝাচ্ছে যে মুর্তি অর্থাৎ যিশুর ভজনা করো । উনি গডের ছেলে । কিন্তু হোল্লাদের কাছে ছেলের কোনো ব্যাপার নেই । আর হোল্লা ধর্ম আকাশ, বাতাস, জল, অগ্নি ও মাটির উপাসনা করে । ওরা আদতে শক্তিকে পুজো করে । মূল শক্তি নিরাকার প্রকৃতি আর তার চারাপাশে এইসব নানান উপগ্রহের মতন শক্তিরা। তাই প্রাণপণ চেষ্টা করছে গ্রীমিদের ওদের এলাকা থেকে তাড়ানোর । ওদের একটাই কথা--আমাদের দেশ ও ধর্ম নিয়ে আমাদের থাকতে দাও । এখান থেকে হঠো । ভাগো । পালাও ।

গ্রীমিরা নিজেদের সেনাশিবির বসিয়ে দিবারাত্রি ওদের পর্যবেক্ষণ করে । পাশ দিয়ে বয়ে চলা রঞ্জা উপসাগর ও বিরজা উপকূল যা কিনা আন্তর্জাতিক এলাকা ; কোনো বিশেষ দেশের নয় সেখানে পাহারা বসিয়ে হঠাৎ হামলা করে । এইসব নিয়ে ইরাজিরা বিচলিত । কথা ওঠে জাতীয় সুরক্ষার । নিজেদের মা, মেয়ে,বোনেদের , শিশুদের রক্ষা করার । এইদেশে নাকি প্রতিটি পুরুষ ও নপুংসকেরা যুদ্ধ করতে জানে । ওদের শিখতেই হয় । নপুংসকেরা মূল সমাজের স্রোতে কাজও করে ।

গ্রীমি সেনারা নাকি এও বলে চেঁচিয়ে ওঠে যে চীন,পাকিস্তান আর তোদের ওপরে তিনখানা নিউক ফেলে দিলেই দুনিয়ায় শান্তি ফিরে আসবে ।

তোরা হলি শয়তানের প্রজাতি ।।ইজরায়েলের গুপ্ত সংস্থা মোসাদের উচিৎ তোদের দেশে ঢুকে সবকটাকে কচুকাটা করা ।

তবে শিরাক মেহেলানি জীবিত থাকতে তা সম্ভব নয় । উনি একাই একশো ও খুবই বুদ্ধিমান ব্যাক্তি । একবার ওদের একটি প্লেন হাইজ্যাক হয় । রাষ্ট্রনেতাকে ফোন করে হাইজ্যাকার । তখন শিরাকের নির্দেশে নেতার ফোন বন্ধ করে দেওয়া হয় । প্লেনটি কোন জনমানবহীন প্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিলো । নানান ভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ট্র্যাক করে শিরাকের বাহিনী কমান্ডো নিয়ে ঐ স্থানে যায় । এদিকে হাইজ্যাকার অবাক ! ডিল করবে না নেতা ? ২৫০ মানুষের জীবনের ব্যাপার , ফোন তো ধরছে না ।

শিরাক মেহেলানি, কমান্ডো বাহিনী নিয়ে ঐ স্থানে গিয়ে , আকাশ থেকে নেমে হাইজ্যাকারদের মেরে উল্টে দিয়ে ঐ প্লেন উড়িয়ে নিয়ে চলে আসেন । এমনই মানুষ ছিলেন উনি । হাইজ্যাকারেরা বুদ্ধু বনে যায় ।

--আমাদের একজন নাগরিককে দেশে বা বিদেশে মারলে আমরা তোমাদের দশজন মানুষকে মারবো । কাজেই সাবধান ।

এই ছিলো ওনার কথা ।

গ্রীমিরা, ইরাজের ভেতরে ঢুকে ঢুকে সাধারণ নাগরিক সেজে ওদের মেয়েদের ফাঁসায় । কেউ ফটোগ্রাফার তো কেউ ফাস্ট ফুডের দোকান চালায় তো কেউ ইঞ্জিনিয়ার । এইভাবে মেয়েদের ফাঁদে ফেলে মা বানায় । তারপর বিয়ে না করে কেটে পরে । তাই এইদেশকে আজকাল দুনিয়া **ল্যান্ড অফ্ বাস্টার্ডস্** বলা শুরু করেছে । এত পিতাহীন শিশু এখন দেখা যাচ্ছে । তারপর তাদের ভবিষ্যৎ হয় কোনো অনাথ আশ্রম অথবা কোনো মিশনারির হাত ধরে গ্রীম দেশ ।

শিরাক মেহেলানির জন্ম সমুদ্র নগর কৈরিতে । ওনার বাবা সমুদ্রের ধারে শঙ্খ দিয়ে নানান জিনিস তৈরি করতো ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো । কোনো ভাবে ভদ্রলোকের দুটি চোখ অন্ধ হয়ে যায় । তবুও হাতের স্পর্শ ও মাপ অনুযায়ী আশ্চর্য সব বস্তু বানাতো । ওরা ছিলো পাঁচ ভাইবোন । শিরাকের যখন দশ বছর বয়স তখন কাজের সন্ধানে তাঁকে চলে যেতে হয় দূরের শহর খৈয়ামে । সেখান থেকে পরে যুদ্ধ শিখতে সরকারি সেনার দলে । যুদ্ধ শিখেই স্থির করেন যে যোদ্ধা হবেন। তখন চিনার সভ্যতা পতনের মুখে । হোল্লারা মাথা চাড়া দিচ্ছে । চিনার রাজপুরুষদের নানান অত্যাচারে মানুষ তিতিবিরক্ত ।

হোল্লা নবী রূপচাঁদামাচ সবাইকে একজোট করে ভাষণ ও বক্তৃতা দিচ্ছেন । দলে দলে যুবাপুরুষেরা এসে যোগ দিচ্ছে । জন্ম হচ্ছে নতুন নতুন নেতার । এইভাবে সৃষ্টি হয় শিরাক মেহেলানির । পরবর্ত্তীকালে হয়ে ওঠেন দোর্দন্ডপ্রতাপ এক রক্ষক । যাকে পড়শী দেশগুলো শুধু নয় বিশ্বের অনেক দেশের নেতারা সমঝে চলতেন ।

ইরাজে এসেছে ভামা বেশ কিছুদিন হল । অনেক কিছু জানতে পেরেছে শিরাকের সম্পর্কে । এবং বুঝেছে যে একে তুখোড় এক যোদ্ধা বলা যায় ; উগ্রপন্থী কখনোই নয়। বরং সম্প্রতিকালের নব টেরেরিস্ট গ্রুপ যারা প্রকাশ্যে মানুষের মাথা কেটে দেয় সেই আইআইআইআই কে উনি ইরাজ থেকে মেরে তাড়িয়েছেন । আর মজার ব্যাপার হল গ্রীম দেশও

ওনার কাছ থেকে কিছু কলাকৌশল তখন শিখে ছিলো আইআইআইআই কে তাড়ানো ব্যাপারে ।

ওদের গুপ্ত সংগঠন ডিকি বলে যে শিরাক মেহেলানির মতন মাস্টার স্ট্র্যাটেজিস্ট ও তুখোড় মিলিটারি মাইন্ড আধুনিক বিশ্বে বিরল ।

উনি একাই আইআইআইআই কে তাড়ানোর ব্যাপারে সাহায্য করতে সক্ষম-- এমনই যুদ্ধকৌশল উনি বলে দিতে পারতেন । অসম্ভব সাহসী এই যোদ্ধা কোনো বর্ম না পরে নিজে যুদ্ধে নেমে যেতেন যেখানে বড় বড় যোদ্ধারা সবসময় নিজেরা চট্ করে লড়াই করেনা । জুনিয়ারদের পাঠায় ।

শিরাক নিজের বডিগার্ডও রাখতেন না । জনসমক্ষে ঘুরতেন । বডি ডবল রাখতেও কেউ দেখেনি । বলতেন, পাবলিকে ঘুরলেই লোকে সন্দেহ করবে কম । আমি একটা জিনিসই জানি-ন্যাশেনাল সিকিউরিটি আর কিছু বুঝিনা ,আমার কাজ পিতৃভূমকে রক্ষা করা তাই শেষ রক্ত দিয়ে করে যাবো ।প্রচন্ড জীবনের ঝুঁকি নিয়েও লেড়ে যেতেন । বলতেন , মৃত্যুই শেষ নয় । আমি আবার আসবো । অপূর্ণ কাজ শেষ করতে ।

কিছু ফেক্ উগ্রবাদী দলও চালাতেন উনি । কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার জন্য ।

হিমল বলছিলো যে এইদেশে মেয়েদের ওরা কন্ট্রোল করে । কিন্তু সে মনে হয় ঠিক বলেনি । কারণ শিরাক মেহেলানির কন্যা নাকি এক গেরিলা । যোদ্ধা । শিরাক নিজে তাকে বহু যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে যেতেন । মেয়ে বাবা অন্তপ্রাণ । বাবাও তাই । কাজেই বহুবার বাবা ও মেয়ে একসাথে বহু যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেছে । মেয়ের নাম গৈরিকা ।

আমাদের দেশের মতন নাম । গৈরিকার ফটো দেখলো ভামা । খুব সুন্দর। ওর বাবাও তো সুপুরুষ ! সিলভেস্টর স্ট্যালনের মতন চেহারা তার ।

তবে গৈরিকার চেহারায় একটা কাঠিন্য আছে । লোকে বলে শিরাকের সমস্ত গুণ তার মধ্যে আছে । হয়ত ভবিষ্যতে সেই বাবার চেয়ারে বসবে । তার বাবা নাকি তাকে বলেছিলেন যে আমরা একসাথে শহীদ হলেই ভালো । কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে মেয়ের আক্ষেপ রয়ে গেছে বাবা তাকে ছেড়ে চলে গেছে । ওদের রাষ্ট্রনেতা তাকে বুঝিয়েছেন যে তার স্কন্ধে গুরু দায়িত্ব দিয়ে তার বাবা শান্তির নিদ্রা দিতে গেছেন । এবার গৈরিকার পালা নিজেকে তৈরি করার ।

ওদের দেশের এক নারী গণিতজ্ঞ আছেন । উনি দুনিয়ার একমাত্র নারী যিনি অংকে ফিল্ডস্ মেডেল পেয়েছেন যা গণিতের নোবেল প্রাইজ বলে অনেকে মনে করেন । নারীরা পিছিয়ে কোথায় ?

যেই ফোর্সের হয়ে কাজ করতেন শিরাক, সেই জাতীয় রক্ষক সংস্থার কয়েকজন সেনা জানালো ভামাকে যে শিরাক সারাটাজীবনই প্রায় যুদ্ধ ক্ষেত্রেই কাটিয়েছেন । বাড়িতে হয়ত বা কয়েকদিন । তবে মেয়ে সাথে থাকলে ওরা খুব মজা করতো । তখন জেনেরাল ও তার মেয়ে মিলে ওদের স্পেশাল খাবার ; মাংসের লাল কোর্মা জাতীয় কিছু যার নাম কিরাৎ মাস্ (লাল মাংস) তা রান্না করতেন ।

ফাঁকা শুষ্ক প্রান্তরে, মেঠো চুলায় আগুন জ্বালিয়ে ;কাঠকুটো দিয়ে হাতা বানিয়ে রান্না হতো । বড় হাঁড়িতে আটা দিয়ে মুখ বন্ধ করে সেই মাস্ । তারপর ওরা মোটা রুটি দিয়ে সেগুলো খেতেন । সেই রুটি বানাতো সেনারা । খুবই মজা হতো ওদের । জেনেরালকে তো অনেকবার হত্যার

চেষ্টা করা হয়েছে । মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেতেন উনি । ঘাড়ে সব সময় মৃত্যু দূতের নি:শ্বাস !! তবুও দৈনিক জীবন যাপনে কোনো ভাঁটা পড়েনি । সবাইকে নিয়ে হেসে খেলে দিন কাটাতেন । বলতেন , আমার স্বপ্ন এই এলাকা থেকে গ্রীমিদের তাড়ানো আর দুনিয়াকে কমিউনিস্ট মুক্ত করা । হ্যাঁ, কোকোমা ১৯ ভাইরাসের তান্ডব দেখে গেছেন তিনি । ইরাজ দেশে সেই ভাইরাসের প্রকোপ দেখেছেন । কীভাবে নিরীহ মানুষকে শেষ করে দিচ্ছে এই প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া -মারণ বীজ যা বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছে শয়তান কমিউনিস্টরাই , দুনিয়ার দখল নেবার জন্য তাও তিনি দেখে গিয়েছেন । তাই বুঝি বলতেন ,

যেখানে মৃত্যুর মিছিল অথবা শোকের সভা

সেখানে কোনো না কোনোভাবে আছে কমিউনিস্ট থাবা ।

আমার স্লোগান হলো --কমিউনিস্ট ধরো আর টিপে টিপে মারো ।

কোকোমা ১৯ ভাইরাসের তান্ডব এখন সারা দুনিয়ায় । হয়ত সবাই এখন মনে মনে এই লাইনগুলোই আওড়াচ্ছে ।

যারা মৃত তারা তো অভাগা আর যারা জীবিত তারাও জানেনা কখন তাদের ডাক আসবে ।

আসলে শিরাক বলতেন যে জগতের এমন অবস্থা করে দিয়েছে এই হতচ্ছাড়া কমিউনিস্টগুলো ; মারণ কোকোমা ১৯ ভাইরাস বায়ুতে ছড়িয়ে যে কেউ বুঝি আর শুদ্ধ বাতাসে নি:শ্বাস নিতে পারবে না কোনোদিন ।

ওনার বাবা তো দৃষ্টি হারান । তো প্রতি রাতে কাজের শেষে, সমুদ্রের ধার দিয়ে অনেকটা পথ তা প্রায় মাইল দুয়েক হবেই ; হেঁটে যেতো একটা

শঙ্খ বাজাতে বাজাতে । বলতো যে এতে তার মন ও প্রাণ চাঙা হয়, শুদ্ধ বাতাস ও সাগরের শীতল পরশ পেয়ে । এটা বৃষ্টিবাদলের রাতেও নাকি নিয়মিত করতো বাবা ।

তবে ওদের দেশে কিন্তু বৃষ্টি ও সবুজের খরা । খুবই কম বৃষ্টি হয় তাই

সবুজ ও ফসল খুব কম । ওরা প্রধানত মাছ , মাংস ও ডিম খায় । তবে ছাগল ও ভ্যাড়া আর হাঁস, মূর্গী ও নানাবিধ পাখী।। এছাড়া কিন্তু গরু, মোষ, শকূর অথবা ঘোড়া খায়না । কোনো বড় জন্তু মারা ওখানে তেমন প্রচলিত নয়। আরেকটি আজব ব্যাপার হল ওদের মধ্যে কেউ বিধবা অথবা বিপত্নীক হলে সংসারে থাকে কিন্তু আর বিয়ে করেনা । স্বামী বা স্ত্রীর সাথে যেই সময় কাটাতো সেই সময়টা ওরা সমাজের সেবায় নিয়োজিত করে । তবে কমবয়সী হলে অনেকে বিয়ে করে তবে তাও কম সংখ্যক লোকই ।তার মানে যে বেআইনি মদ বিক্রি হয়না বা দ্বিতীয় বৌ নেই কিংবা স্বামী নেই এরকম নয় তবে তা অন্য ধর্মের মানুষের জন্য । মূল ধর্মের ইরাজিরা এগুলো থেকে নিজেদের বিরত রাখে । হোল্লা ধর্ম এগুলো করতে দেয়না । পূর্বজ সভ্যতা চিনারের মানুষ করতে চায় । তাই তারা নাকি গ্রীমিদের এনে এখানে বসাতে চায় । তাই সবাইকে খ্রীস্টান করে ফেলতে চায় ,মেয়েদের নাঙ্গা করে নাচাতে চায় ।

বহুবিবাহ , পর্ণগ্রাফি , জুয়া, ওপেন ম্যারেজ, সমকামিতা, শিশুদের দেহের সৌন্দর্য্য থেকে যৌন তৃপ্তি নেওয়া- সবকিছু কমপ্যাক্ট থাকবে , অর্গি,ফোর্সামের আনন্দ সবার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া এসব চালু করতে ইচ্ছুক ওরা ; পশ্চিমের মতন । অবস্থা এমন যে অনেক মেয়ে প্রথম যৌবনে অস্ত্রপচার করে হয় জরায়ু বাদ দিয়ে দেয় অথবা যোনিপথে একধরণের ধারালো সিলিকনের জিনিস পরে থাকে যাতে রেপিস্টের আঘাত লাগে । সমাজে বিষকন্যার সংখ্যাও কম নয় । হেভি ডোজে

রেডিয়েশন নিয়ে কিছু নারী সবসময় বড় বড় শহরে ঘোরে গ্রীমি নারীলোলুপ কুচক্রীদের নীরবে এলিমিনেট করার জন্য । সমাজের এমনই শোচনীয় হাল !!

একেই লোকে একে ল্যান্ড অফ্ বাস্টার্ড্ বলা শুরু করেছে । এখন হাল না ধরলে আর রক্ষা নেই । বিদেশী শক্তি এসে সব লুটে পুটে গেড়ে বসবে । গোরাদের ইতিহাস তো তাই বলে । যেখানে গেছে লুটেপুটে পালিয়েছে --same case in India !

ভামা আর বলেনা যে তার বাবা আদতে ভাইকিং ,যাদের জলদস্যু বলে বদনাম রয়েছে । আবার তার বাবাই তাকে নিয়ে এসেছে মায়ের ঘৃণ্য অতীতের গুহা থেকে । মানুষকে কি আর একমাত্রিক রূপে বাঁধা যায় না করা উচিৎ । আধুনিক জগতের কত কিছুই তো গোরাদের অবদান ।আবার কত কিছু আছে যা ইরাজের মতন দেশ আমাদের শিখিয়েছে ।

যেমন পাথরকে কোনো যন্ত্র ও অস্ত্র ছাড়াই একেবারে পাতলা কাগজের মতন শৈল্পিক রূপ দেওয়া হয়ত ওরাই প্রথম করে দেখিয়েছে । হ্যাঁ, ভারতের দিলওয়ারা মন্দিরের বহু আগেই । এই দেশে চমৎকার রঙীন সব পাথর পাওয়া যায় । ওরা বলে মার্বেল । লাল , নীল, হলুদ, সবুজ । কিন্তু ভূবিদ্রা কী বলেন তা ভামা জানেনা ।

ভামার বাবা উল্ফ থর্প একটা কথা সবসময় বলতো, কোনো জাতি, ধর্ম বা বর্ণের মানুষের প্রতি ঘৃণা নিয়ে কখনো কারো উপকার করা যায়না । তুমি কাউকে ঘৃণা করলে , শুদ্ধ হৃদয়ে অন্য কারো উপকার করতে পারবে না । তোমার উপকারটা আদতে একপ্রকার ভড়ং হবে । **ডোন্ট এভার ফাইট এগেনস্ট দা পার্সেন , ফাইট এগেনস্ট দা ইস্যু ।**

ভামার একটা দল আছে অস্ট্রেলিয়াতে । নাম **লাল পিঁপড়ে** । সেই দলের সদস্য সংখ্যা সাত । ওরা সাতজন মিলে প্রতি সপ্তাহের শেষে মানে শনিবার করে নানান সাজে সেজে বিভিন্ন জায়গায় যায় ও আনন্দ করে , লোকের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে মজা দেখায় । যেমন একবার মরুভূমিতে চলে যায় উট নিয়ে যাযাবরের বেশে । কখনো ক্যাসিনো ম্যানেজারের পোশাকে ঘোরে । কখনো ক্লাউন হয়ে । কখনো বা উন্মাদ সেজে । ঐ ফ্যান্সি ড্রেস খেলার মতন । নিজের মতন করে আনন্দে মাতে ওরা । ওদের দলে একজন আছে যে মেক আপ করে দেয় । তার কাজ প্রফেশনাল থিয়েটারে মেকআপ করা । মেকআপ আর্টিস্ট সে ।

আর অন্য পাঁচজন কেউ টিচার , কেউ মিউজিশিয়ান---

ব্লু -গ্রাস মিউজিক করে কেউ বা ধাত্রী আর অন্য দুজনের মধ্যে একজন

আগে উন্মাদাশ্রমে ছিলো এখন ওষুধ খেয়ে সুস্থ । এদেশে পাগল হয়ে গেলে সরকার পয়সা দেয় । ভারতের মতন ঢিল মেরে পরপাড়ে পাঠায় না । কাজেই লাল পিঁপড়ের এই সদস্য সরকারের পয়সায় থাকে আর ওদের দলের হয়ে বেড়ায় ও টুকটাক কাজ করে । ওর প্যানিক অ্যাটাক হয় । এখন সুস্থ । মানুষের মাঝে ভালো থাকে ।

আর শেষজন ময়লার গাড়ি চালায় । লাল পিঁপড়ের দল নিয়ে একবার ইরাজে আসবার ইচ্ছে আছে । তবে ইচ্ছেগুলি ডানা মেললেও সবসময়

সবকিছু হয়ে ওঠেনা । এখন তো ট্যুরিস্ট ভিসায় এসেছে এক ট্যুরিস্ট কোম্পানির সাথে । ঘোরা বেড়ানো সবই খুব সীমিত ।

তবে জেনেরালকে নিয়ে বই লিখবে বলে কিছু মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে । তাদের ঠিকানা যোগাড় হয়েছে ওরই কিছু অস্ট্রেলিয়ান আদতে ইরাজি, হাই প্রোফাইল বন্ধুর কল্যাণে । হিমল তো প্রতিথযশা বিজ্ঞানী তাই সমাজের উঁচু স্তরে ওদের যাতায়াত আছেই ।

ইরাজে সবাই এই দেখে অবাক হয়েছে যে এই প্রথম একজন তাও এক নারী ,সাদাদের দেশ থেকে এসেছে তাদের দেশে-- যে জানে এই মানুষটি কখনো সন্ত্রাসবাদী হতেই পারেননা । কোথাও না কোথাও দুনিয়ার বুঝতে ভুল হচ্ছে । যদিও ভারত আর ইরাজ দেশ গভীর বন্ধুত্বে বাধা । একবার সেই সম্পর্কে চিড় ধরে । তখন শিরাক মেহেলানির কারণেই ভাঙা আয়না জোড়া লাগে । মিটিং এ উঠে দাঁড়িয়ে উনি বলেন , নাহ্ ! আমরা ভারতের সাথে সম্পর্ক ছেদ করবো না । আমরা পুরনো বন্ধু । এই বন্ধুত্ব শুরু হয়েছিলো ১০০ বছর আগে ।

সবাই অবাক। কে এই সাধারণ পোশাক পরা, অতি সাধারণ ভাবে এক কোণায় চুপচাপ বসে থাকা মানুষটি ? কোনো মিলিটারি পোশাকও পরে নেই ;তাবড় তাবড় জেনেরালদের মিটিং এ ?

এক অফিসার বলেন , **ইনিই সেই ইরাজ দেশের দোর্দন্ডপ্রতাপ জেনেরাল শিরাক মেহেলানি । যার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায় ।**

সত্যি তো ! দেখে বোঝার উপায় নেই ! নেই কোনো মেডেলের ঝন্‌ঝনানি । রঙীন ফিতের প্রহসন । কথার ফুলঝুরি ।

--আমি একজন যোদ্ধা । আমি কথা কম কাজ বেশিতে বিশ্বাসী । আর আমি অত কথাও বলতে জানিনা ।

অথচ যখন বক্তৃতা দিতেন লোকের গায়ের লোম খাঁড়া হয়ে যেতো ।

নিজে অনেক বছর নাকি এক ধরণের কুংফু শিখেছেন যা যুদ্ধের ক্ষেত্রে লাগানো যেতে পারে বা কাজে লাগে । অনেকটা আমরা বাইরের লোকেরা যেমন **শাওলিন মংকদের** কথা জানি সেরকম কোনো অন্যধারার বস্তু বা ট্রেনিং । সঠিক কি বোঝা গেলোনা । তবে পশুপাখির ক্ষিপ্রতা ও স্বাভাবিক ছন্দে শত্রুকে আক্রমণ ও প্রয়োজনে স্পিরিচুয়াল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিপক্ষকে ঘায়েল করা এইজাতীয় কিছু তা বেশ বোঝা গেলো ।

সুগ্রন্থিত দেশে , সুললিত ভাবে মাথায় ওড়না দিয়ে ঘুরতে মন্দ লাগেনা । দারুণ সুন্দর দেশে । মেয়েরা সবই করছে কেবল মাথায় কাপড় । কেউ গৃহবন্দী নয় । আকাশটা খুব নীল । মেঘ বেশী দেখা যায়না । বাদল বায়ু প্রায় নেই । পাথুরে মাটি । রঙীন পাথরের দোকান পাঠ । ঘরবাড়ি । উঁচু উঁচু পাথুরে , সবুজের লেশবিহীন ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড় ।

সেখান থেকে ঝুলছে বীর পুরুষদের সব কফিন । মানে গোলাপকাঠের বাক্সে চিতাভস্ম । ওপরে সাজানো সবার প্রিয় জিনিস । মমিদের যেমন কফিনের ভেতরে তাদের প্রিয় জিনিস দিয়ে দেওয়া হয় সেরকম এদের দেশে, মৃতদেহ পুড়িয়ে সেই ভস্ম নিয়ে বাক্সে পুড়ে ওপরে প্রিয় জিনিস সাজিয়ে রেখে দেয় । এরা শহীদ বলে এদের কফিন বড় আর প্রিয় জিনিসের বাক্স বড় । ওপরে কিছুটা চিতাভস্ম আলাদা করে রাখা থাকে একটা গোলাকৃতি পাত্র । তার কোনো বিশেষ কারণ আছে কিনা ভামা জানেনা । সেই চিতাভস্ম রাখা হয় নানান কারণে ।

এখানে এসেই ভামা বাতাসে হাল্কা স্পর্শ পেলো । কেমন চেনা স্পর্শ । মহাকাশের ওদিক থেকে যেন কেউ তাকে ছুঁতে চাইছে !

খুব চেনা একটা আতরের গন্ধ । অসম্ভব শীতল বাতাস ওকে ঘিরে ধরলো । কিছু শুকনো পাতা যার রং গাঢ় লাল, বাদামী ও কমলা ওকে এসে প্রায় ঢেকে ফেললো । মনে হল অশরীরি কেউ ওকে কিছু বলতে চাইছে । হঠাৎ ওর মোবাইলটা অফ্ হয়ে গেলো । এখন গোধূলি । আজকে ও সমাধি দেখে হোটেলে ফিরবে । কাল সকালে প্লেন ধরে ইরাজের রাজধানি হয়ে ফিরে যাবে সিডনি । লম্বা সফর ।

মনে হল দূরের পাহাড় থেকে কেউ খুব জোরে চীৎকার করে ওকে ডাকছে বহুযুগের ওপাড় হতে , ভামা --ভা--মা আমাকে চিনতে পারছো ?

ভামা ? আমি শিরাক বলছি ?

স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে !

সত্যি, নাকি হিমলের কথামতন ও আস্তে আস্তে স্কিজোফ্রেনিক হয়ে উঠেছে ? হ্যালুসিনেশান? সাইকোসিস্? যা আর কেউ দেখতে বা শুনতে পায়না ? ও কি সত্যি পাগলিনী ? ও তো বিবাহিতা তাহলে ? বুকের ভেতরে সেই উথাল পাথাল , যেন বসন্তের রং চুরি করে এই পাথুরে পাহাড়গুলিতে কেউ রং জোছনা ঢেলে দিয়েছে ।

এমন সময় দ্রুত পদশব্দ । কিছু লোক আসে ওখানে । চিতাভস্মের পাত্র থেকেই কিছুটা নিয়ে সেই বিভূতি ওরা ভামাকে দেয় । বলে , আমাদের দেশে তো দ্বিতীয় বিবাহের নিয়ম তত নেই কিন্তু উনি বেঁচে থাকলে আজ আমরা সেই রীতি ভেঙে তোমাকে ওনার দ্বিতীয় স্ত্রী করে দিতাম । এতদূর দেশ থেকে তুমি এসেছো । একটি পশ্চিম দেশ থেকে এসেছো ।

খবরের কাগজে ও টিভিতে নানান খবর দেখেও বিশ্বাস করোনি । নিজে যাচাই করতে চেয়েছো । এতখানি দরদ ও বিশ্বাস একজন ভীনদেশীর জন্য তাও যার বাজারে বদনাম একজন সন্ত্রাসবাদী বলে , সত্যি আমাদের কাছে এক বিরাট পাওয়া । আজ বুঝতে পারলাম মানুষ একত্রে বাস করলেও তাদের চিন্তাধারা একেবারেই ভিন্ন হতে পারে । এতো ভালোবাসা ! তোমার দেশের সাথে আমরা সন্ধি করে নিতাম এইভাবে যেমন আগের দিনে রাজারা করতেন ।

(ভালোবাসার টানেই তো এসেছে সে। সেই হৃদয়ে ফুটো ! প্রেম করে বিয়ে করেও যেই ছিদ্র রয়ে গেছে । আসলে প্রেমিক আর সোলমেট বোধহয় এক জিনিস নয়)

এরপর শিরাক মেহেলানির চিতাভস্ম ভামাকে দেওয়া হয় । সংগ্রহের জন্য, এটা ওর ব্যাক্তিগত বস্তু । ও বলেছে এটা দিয়ে ও ট্যাটু করবে ।

ট্যাটু করবে , **কালপুরুষ** বলে । কালপুরুষ কী ওদের বুঝিয়ে বললো ।

এবার থেকে মরণ অবধি তুমি আমাকে সব সময় ছুঁয়ে থাকবে । পরজন্মে কি দেখা হবে ? এই বীরপুরুষের সাথে ?

হতেও পারে ! কে জানে । তখন গৈরিকা উড বি দেয়ার চাইল্ড । ভামা অ্যান্ড মেহেলানিজ চাইল্ড । অনলি দা নেম উড বি ডিফারেন্ট -----**বিক্জ দা বডি অনলি ডাইজ ।**

The End

ছাল

মেয়েটি, ট্রেন দূর্ঘটনায় নিঁখোজ হয়েছে এরকমই বলেছিলো সরকার ।

মাওবাদীরা যেই কলকাতা থেকে মুম্বাইগামী ট্রেন উড়িয়ে দেয় তারই যাত্রী ছিলো গোদাবরী ; পেশায় মেয়ে নেগোশিয়েটর । দুইপক্ষের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করা ছিলো কাজ । তবে এই সন্ধি হল আর্থিক দিক থেকে সন্ধি । দুইপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করে, এক একটা বিজনেসের আর্থিক ডিল করা ছিলো তার পেশা । উচ্চতা ৪ ফুট থেকে অল্প কম । পৃথুলা । খুব ফর্সা আর মিষ্টি মুখশ্রী । লোকে ওকে বামন, বেঁটে কাত্তিক এইসব বলতো । রাগতো না সে। হেসে বলতো ,আরে আমি একটু শর্ট হাইট ,বামন নই ।

দুঁদে নেগোশিয়েটর ছিলো সে। ছিলো কারণ ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হবার পর থেকে নিঁখোজ । অনেক নতুন ব্যবসাদারকে সে ফান্ড যোগাড় করে দিয়েছে । একবার রাজমিস্ত্রিদের ইউনিয়নকে মোটা অর্থ যোগাড় করে দেয় । বলতো কোটিতে টাকা যোগাড় করা লাখের থেকে সহজ । যত বড় সংখ্যা তত সহজ তা জমা করা ।

খুব লোকপ্রিয় ছিলো সে । শ্রদ্ধা করতো ওরা তাকে । গোদাবরীকে আদর করে লোকে ডাকতো গোদু বলে । গোদুর আপন বলতে ছিলো মা , বাবা

ও অধ্যাপক স্বামী । স্বামীটি ওকে বিয়ে করে, ওর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে । বলতো, গোদু আমার বেঁটে ও মোটা । কিন্তু মাথাটা ওর তীক্ষ্ণ ও সোনায় মোড়া ।ওর মগজটি আমাদের সংরক্ষণ করা উচিৎ !

বয়স কতই বা হবে ওর ? এই ধরো চল্লিশ ! বা বেয়াল্লিশ ।

গোদু বলতো , মিস্ত্রীরা হাতের সবকটা আঙুলে মোটা মোটা ধাতব আংটি পরে নেগোসিয়েশান টেবিলে বসে । যাতে উনিশ বিশ হলে এক ঘায়ে কাৎ করে দিতে পারে, অপোনেন্টকে । আর মূলতঃ মারোয়াড়িরা প্রতিটা পাই পয়সা নিয়ে দরদাম করতে অভ্যস্ত । আগে গোদু ভাবতো যে ওরা চামার । কিন্তু পরে বুঝতে পারে যে এটা একটা আবেগের খেলা । ইমোশনাল গেম । প্রতিটা পয়সা নিয়ে দরদাম করতে শুরু করলে শেষে বড় সংখ্যা নিয়েও লোকে দরদামে অভ্যস্থ হবে । তখন মূল বিশাল অঙ্কটা যখন কোটি বা ৫০ লক্ষতে পৌঁছাবে, সেটাও কমিয়ে নেওয়া যাবে ।

এইরকম মেয়ে গোদাবরী হারিয়ে গেলো । ওর অনেক মৌলিক গুণ ছিলো ।সাজতোও খুব । চড়া মেক আপ আর বড় বড় নখ, নাকছাবি, কানে অসংখ্য দুল ছাড়াও বাম হাতে ছিলো একটি সোনার মোটা চেন । রোজ গোল্ড । তাতে একটি বড় লকেট । লকেটটি রথের চাকার মতন । অবিকল একটি রথের চাকা যেন !

গোদাবরীর স্বামী ছিলো নেগোশিয়েট করার কোর্স এর অধ্যাপক । যেখানে পড়াতো সেখানে বহু সার্টিফিকেট কোর্স ছিলো । প্রায় ৮০০র বেশী । প্রতিটি ৩-৪ মাসের কিন্তু এর মূল্য অনেক । ডিগ্রী না করেও এই কোর্সের জোরে মানুষ এগিয়ে যেতে পারতো এমনই উচ্চমানের এইসব কোর্স । কিন্তু যেই প্রতিষ্ঠানে ভদ্রলোক পড়াতো সেখানে ডিগ্রীর চেয়ে রিসার্চ ও সার্ভেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো ।

সার্টিফিকেট কোর্স ও সরাসরি ট্রেনিং ।

গোদাবরী অনেক বেশী সফল ছিলো ওর স্বামীর চেয়ে ।

গোদাবরীর মা, মিসেস রুইদাস একটি জমি কিনে নতুন বাড়ি তৈরি করে । পুরনো বাড়িটায় গোদুর স্মৃতি চারিদিকে । তাই নতুন জমি কিনে, খাদ বুজিয়ে বাসা বানানো হয় । শহরের ময়লা দিয়ে হয় ল্যান্ডফিল। জমিগুলো ভরাট করা হয় । পুকুর, দিঘী বোজানো, মাঠঘাটের পাশে বড় বড় গর্ত বুজিয়ে বাসা, হাসপাতাল বানানো হয় । এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে চাষ আবাদও হয় ঐসব জমিতে ।

বাড়ির নাম আঁচল । কিন্তু আঁচল কার জন্য ? বাবা আছে , মাও আছে আর আছে পোষা কুকুর কোকো আর পাখি কিকি । কিন্তু গোদু তো আর আসেনা ? সে কোথাও নেই । যেন হঠাৎ-ই ভূমিতে, পাতালে তলিয়ে গেছে ।সেদিন বিকেলে মাকে বললো, মা আমি ঘুরে এসে তোমার কাছে যাবো ।

মা ওর প্রিয় নারকেল নাড়ু একটা টিফিন বাটিতে ভরে দিয়েছিলো । পথে খাবে বলে । কত মমতা মাখিয়ে নাড়ুগুলো ভরে দেয় ব্যাগে ।

সেই মেয়েও নেই, টিফিন বাটিও নেই !

আগে মানুষ ভাবতো , আমার বাড়ির নিচে পাতাল আছে । মাটি আছে , পাথর আছে , কাঠকুটো আছে কিছু হয়ত বা গাছের পরিত্যক্ত ছাল । কিন্তু এখন মানুষের বাসার নিচে থাকে অন্যের ব্যবহৃত নানান দ্রব্য , ফেলে দেওয়া খাবার দাবার , প্লাস্টিক, টিনের ক্যান , কাঁচ আরও কত কিছু !

মেঝে ডেবে গেলো খুব তাড়াতাড়ি । হয়ত চাপ সইতে পারেনি ।

আঁচল আবার ভাঙতে হল ।

অনেকগুলো ঘর ভাঙলেও খাবার ঘরের নিচে থেকে বার হল আস্ত কঙ্কালের নানান অংশ । বিভিন্ন প্যাকেটে করে কেউ যেন ফেলে দিয়েছিলো । মানুষটাকে মেরে, কেটে পিস্ পিস্ করে নানান প্যাকেটে পুরে কেউ ফেলে দিয়েছিলো ময়লার বিনে । বিভিন্ন সময়ে সেগুলো চলে গেছে ল্যান্ডফিলের জন্য জমানো পরিত্যক্ত জিনিসের ঢিবিতে ।

কার কঙ্কাল ?

রাশি রাশি লোক এসে ভীড় করেছে ওদের আঁচলে । আঁচলের তো ভগ্ন দশা । তারই মধ্যে যখন হাতটা বার হল তখন আর কারো সংশয় ছিলো না যে এটা গোদুরই কঙ্কাল ।

হাতে সেই রোজ গোল্ডের চেন । রথের চাকার মতন নক্সা করা লকেট ।

ট্রেনে উঠেছিলো সে । টিকিট কনফার্ম ছিলো তার । ছিলো না শেষ মূহুর্তে যেতে চাওয়া তার স্বামীর । তার স্বামীও যে গিয়েছিলো এটাও জানতো না কেউ ।

শেষকালে দুজনেই, কিছু দূরে গিয়ে অন্য স্টেশানে নেমে যায় ।

তাকে কী করে মারলো তা জানেনা কেউ ।

কেন মারলো তা না জানলেও লোকে মনে করছে যে এটা ঈর্ষার ব্যাপার ।

যেই অধ্যাপক তাকে শিখিয়েছিলো নেগোশিয়েট করার কলাকৌশল সে একজন সাধারণ চাকুরে , অতি কম মাস মাইনে আর গোদু একজন রীতিমতন নামজাদা মানুষ । গোদুর পয়সায় বছরে দুবার ছুটি কাটাতে যায় ওরা । গোদু ডিল করলে কমিশন পায় ভালো তাতেও ওদের নতুন গ্যাজেট্স্ হয় , টয়োটার গাড়ি হয় ।

টয়োটার টেঁকসই গাড়ি নয় , ধরো ল্যান্ডক্রুজার ।

গোদুই সব । গোদাবরী !

অন্যপক্ষকে চাপে রাখা যাকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলো অধ্যাপক স্বামী ।

নেগোশিয়েটিং টেবিলে বসে অপর পক্ষের সামনে, কাপে থুথু ফেলে তাকে নিম্নমানের দেখানো ও চাপে রাখা শিখিয়েছিলো গোদুকে । ও অনেক জায়গায় তা কাজেও লাগায় । বলেছিলো বরকে । উত্তম নাম তার । উত্তম আর গোদাবরী । এখন সেই উত্তমই অধম হয়েছে । মেরে

ফেলেছে স্ত্রীকে --মধ্যম কিছু নয় একদম এক্সট্রিম্ ! বলে ওঠে পড়শি কিঙ্কিনী ।

কোকো হল কুকুর, কিকি হল পোষা পাখি আর পড়শি হল কিঙ্কিনী !

ছন্দময় জীবন ওদের । শুধু ছন্দহীনা গোদাবরী !

কিঙ্কিনীর পতিদেব কঙ্কন মন্ডল বলে ওঠে -- নতুন কোনো ঘটনা তো নয় এটা , ইদানিং এরকম প্রায়ই হয় । আগেও হতো । মানব জমিনের মূল আবেগ ঈর্ষা, লোভ, কাম আর রাগ । আগে এরকম ঘটনা কম হতো কারণ লোকের ব্যবহারে ও চিন্তায় একটা আব্রু বা ছাল ছিলো । এখন সবকিছুই খুল্লাম খুল্লা হয় ।ভারতীয় সভ্যতা নারীদের মায়ের আসন দিয়েছে । আজকাল মায়েরাও দেখি নটী বিনোদিনীর মতন সাজ সজ্জা করে বার হয় । তাই হয়ত মমতার ছায়া থেকে যারা বার হয়না তাদের ছাল ছাড়ানোর জন্যেই গোদাবরীর পতিদেবের মতন লোকেরা ময়দানে নেমেছে ।

তদন্তে বার হয় যে হিংসার কারণেই নিজ হাতে স্ত্রীকে মেরেছে উত্তম ।

তবে অনুশোচনাও হয়েছে । দেরীতে হলেও বুঝেছে যে স্ত্রীর সাফল্য আসলে স্বামীর আর উল্টোটা । এখানে ঈর্ষার কোনো স্থান নেই ।

পতি-পত্নী একে অন্যের পরিপূরক ।

তবে গোদাবরীকে তো আর বাঁচানো যাবেনা । তাই যতদিন না ফাঁসি হয় ততদিন লোকটি স্থির করেছে যে কারাগার থেকেই দম্পতিদের জন্য

কাজ করবে । ম্যারেজ কাউন্সেলিং করবে যাতে ডাইভোর্স রেট কমে যায় আর কেউ কারো ওপরে সত্যি সত্যি মানে আক্ষরিক অর্থেই খড়্গ-হস্ত না হয় ।

উগ্র

মিম্‌চন্ডী গ্রামে একটি মন্দির আছে । খোলা আকাশের নিচে একটি বিশাল পাথরের ওপরে অনেক শিলা খন্ড। তার ওপরে লাঠিতে নানান আকারের কাপড় ঝুলছে । রং ঘিয়ে । চওড়া লাল পাড় ওপরে ও নিচে । পাথরের পাশে বোর্ডে লেখা কর্ণচন্ডী মা ।

এই এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায় মিম্‌ বসবাস করে । অনেক পুরনো উপজাতি ।পরে এখানে কিছু খনি আবিষ্কার করা হলে শহুরে মানুষও আসে ।

এখন আধাশহর হিসেবে পরিচিত মিম্‌চন্ডী গ্রামের ,কর্ণচন্ডী মায়ের থান বিশেষ জাগ্রত বলে কথিত আছে ।

আগে আদিবাসীরা এখানে পুজোপাঠ করতো । নরবলি হতো । এখন নরবলি হয়না তবে বিট্‌ আর কাঁঠাল বলি হয় । বিট্‌ এর রং রক্তের মতন আর এঁচোড় মাংসের মতন বলে । পূজারি এখন এক সাধু । জাতিতে ব্রাহ্মণ । একা এখানে একচালার ঘরে বসবাস করে । নাম কেশুবাবা ।

পাশে শ্মশান । অনেক মড়া পোড়ে । ইলেকট্রিক চুল্লি নেই । কাঠ দেওয়া বারণ । তাই কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালানো হয় । পোড়া মাংস পিন্ড পড়ে থাকে । এলাকায় হায়না আছে । আরো নানান হিংস্র পশুর বাস । লোক বলতে বেশিরভাগই আদিবাসী । ওদেরই জায়গা এটা ।আশেপাশের কিছু দোকানও ওদেরই ।ওরাই বিকিকিনি সারে ।চায়ের স্টল, ফুলুরির দোকান, মিষ্টির দোকান সবই ওদের । এমনকি অঞ্চলের দুটি বিদ্যালয়ও ওদেরই জন্য নির্মিত । মিম্‌চন্ডী সম্মিলিত বালক ও বালিকা বিদ্যালয় ।

একবার এই মন্দিরে বাজ পড়ে । বনজরা বাজ পড়াকে অশুভ মানে ।

যদিও বিগ্রহ মানে শিলাখন্ডে কোনো ক্ষতির চিহ্ন দেখা যায়নি তবুও ব্রাহ্মণেরা ওদের বোঝায় যে দেবী রুষ্ট হয়েছেন বলে বাজ পড়েছে । এটা সর্তক করা হচ্ছে । এখনও যদি পূজারি আদিবাসীই থাকে তাহলে পরে বাজ পড়ে পুরো মন্দিরসহ গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে । তাই বুঝি আজকাল ব্রাহ্মণ পূজারি ব্যাতীত অন্যান্য ভ্রামণিক ও শহুরে মানুষেরা মন্দির ঘিরে থাকে । জাগ্রত বলে। লোকের চাহিদার শেষ নেই । এটা , সেটা , ওটা চাইতেই থাকে । একটা পূর্ণ হলে অন্য আরেকটি । এইভাবে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে জড় জগতে । আর চাহিদা পূরণের জন্য সাহায্য নেয় দেবদেবীর । মা কর্ণ চন্ডী এমনই এক জাগ্রত দেবী । মন্দিরে কাপড় চড়ালে মনস্কামনা পূর্ণ হয় ।

এই কাপড়ে রং লাগায় গাঙ্গু । গাঙ্গু মিম্‌ তার পুরো নাম ।

লোকটির একটি নয়নমণিতে আলো নেই । নেই মোমের স্পর্শ । চোখটি শুধু অন্ধই নয় কেমন যেন বাইরে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে । তবুও সেই এক

চোখ নিয়েই সে একের পর এক ঘিয়ে কাপড়ে লাল লাল দুই চওড়া পাড় এঁকে চলে ।

পুজোর সামগ্রী সাজিয়ে বসে পুরোহিত মশাই । কিন্তু কাপড়গুলো আসে সেই গাঙ্গুর হাত ধরেই ।

তার মা নাকি তাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলো । এখানে গঙ্গা নেই তবে একটা বড় নদী আছে । তার নাম মিম্ গঙ্গা । সেই জলে কানা ছেলেকে ফেলে দিয়ে আসে তার মা । কিন্তু তাকে তুলে নিয়ে মানুষ করে এক বুড়ি । সে আগে এইসব কাপড় রাঙাতো । পরে হাতে ধরে গাঙ্গুকে সেসব শিখিয়েছে ।

গাঙ্গুর বড় সাধ একবার মায়ের শিলাখন্ডকে স্পর্শ করে । আজকাল ব্রাহ্মণ ব্যাতীত ঐ মূর্তি মানে পাথর ছোঁয়ার অধিকার কারো নেই ।

লেখিকা এসেছে এই থানে । কিছু কথা হল স্থানীয় মানুষের সাথে ।

গাঙ্গুর দেওয়া কাপড় নিয়ে মায়ের শিলাখন্ডে চড়ালো । লেখিকা নাস্তিক । কিন্তু সব ধর্মের আড়ালের দর্শনকে ছুঁতে চায় ।

দর্শন বলে সবাই অমৃতের সন্তান । আবার যেই গাঙ্গু কাপড় রাঙায় সে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত স্রেফ ব্রাহ্মণ নয় বলে । অথচ এটা ওদেরই থান ও স্থান ।শহুরেরা বলে-- শাস্ত্র । বনজরা উগ্র , সভ্য-ভব্য নয় । নম্র নয় । কথায় কথায় ছোরা বার করে ।

আর আদিবাসীরা বলে ওদের মা এই কর্ণচন্ডী । মাকে সন্তান ভুলে যাবে ? কাছে যাবে না ? শাস্ত্র জানেনা বলে ? মা ও সন্তানের মাঝে আবার কিছু থাকে নাকি ?

--গাঙ্গু ! ডাকে লেখিকা ।

করুন এক চোখে চায় মানুষটি । ছোটখাটো চেহারা । সীসার মতন বরণ । পরণে একফালি লাল কাপড় । খালি গা । মুখে বুঝি এক খিলি পান । মিঠে গন্ধ ভেসে আসে । মিঠে বনফুল আর পানের সুগন্ধ মিলেমিশে যায় ।

এই মন্দিরে দেবীকে বনফুল দেওয়া হয় । সেটাই রীতি । সবই একই আছে কেবল আদিবাসীরা আর বিগ্রহ স্পর্শ করতে পারেনা ; ছোটজাত বলে ।

ব্রাহ্মণ ও বনজ --দুই দলের মাঝে ফালাফালা হয় লেখিকা ও গাঙ্গুর চেতনা । দুইরকম ভাবে । তবে দুজনেই মনে মনে ভাবে ---গাঙ্গু কি অমৃতের সন্তান নয় ? তাহলে এই উগ্রের উৎস কোথায় ? গোমুখ বা গঙ্গোত্রি তো নয় সবাই জানে তাহলে কোথায় সেই স্থান ? অমৃতের বাইরে কি কিছু আছে?

প্রেত তাত্ত্বিক শ্রী বিশ্বনাথের ন্যাকড়া চন্ডী মন্দির ও জ্ঞানেশ্বরী ট্রেন দূর্ঘটনার ভিডিও দেখে এই দুটি গল্পের প্লট মাথায় আসে। নানান তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিও দেখার পরে নানান প্লট কিলবিল করে আর আমি তাই দিয়ে গল্প ফাঁদতে বেশ ভালোবাসি । তাই ভিডিও দাতাদের ধন্যবাদ জানাই ।

ভীমা

রহস্যময় দেশ অ্যাফ্রিকা থেকে ওলিম্ দেশে আসা ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভীমবিয়িকে লোকে ছোট করে ভীমা বলে ডাকে । ঘাড় অবধি একরাশ কোঁকড়া চুল । কিছু বেণী করা কিছু খোলা ।

ভীমা থাকে পাহাড়ি এক ঝোরার ধারে । এই জায়গার একটা সুন্দর নাম আছে । নুহা । নুহার এক ঝর্ণার ধারেই বসবাস ভীমার । সঙ্গী এক কালোমেয়ে আদিবা ।

আদিবা জাতিতে মুসলিম। ভীমা ক্যাথলিক্ । তাতে তাদের বন্ধুত্বে কোনো বাধা পড়েনি । ভীমা কাজ করে মৃত পশুর দেহ বহনের গাড়িতে । আর আদিবা একটা কাফেতে রান্না করে । এই কাফে ডিসেবেল মানুষদের খাবার দেয় । সস্তায় । বেশিটা পায় সরকারের কাছে থেকে, বাকিটা খদ্দেরা অল্প দামে কিনে নিয়ে যায় ।

ভীমা আর ওর বৌয়ের খুব ভাব । ওদের একটা শিশু আছে । সে খুবই ছোট । নাম জুন । ডাকনাম জুনি ।

সুখের সংসার , তাই ভালই দিন কাটছিলো ।

বাধ সাধলো জুনি । ওকে একদিন কাজ থেকে ফিরে, বাঁদরামো করার সময় চড় মারে ভীমা । জুনি , পুলিশে ফোন করে । ভীমাকে আদালতে যেতে হয় ও অনেক কষ্টে সে ১৫ বছরের হাজত বাস থেকে নিষ্কৃতি পায় ।

ওলিম্ দেশে শিশুকে মারা মহা অপরাধ । যতই দুষ্টুমি করুক তাকে বোঝাতে হবে ও সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে । দরকার হলে কাউন্সেলিং করা যায় কিন্তু মারা যাবেনা । ভীমা সাধারণতঃ মেয়েকে মারেনি কোনোদিনও । সেদিন একটু মেজাজটা খিট্খিটে ছিলো । আসলে কালো বলে এলাকায় কোনো ক্রাইম হলেই লোকে ভীমাকে আগে সন্দেহ করতো । কোনোদিনই ওকে কোনো অপরাধের জন্য ধরা যায়নি কিন্তু সন্দেহ বাড়তেই থাকে ।

বেশ কিছু বাড়ি পুড়ে গেছে দাবানলে । লোকে বলে , ভীমাই আগুন লাগিয়েছে ।

কারো গাড়ি থেকে কাঁচ ভেঙে কিছু চুরি হলে লোকে ভীমাকেই সন্দেহ করে ।

বুড়ি লিডিয়া মরলো হৃদরোগে । লোকে বললো, পড়শী ভীমা ব্যাটাই ওকে স্ট্রেস্ দিয়েছে নির্ঘাত ।

এইসব ছাইপাশ সহ্য করে করে আর শুনে ভীমা বেজায় খেপেছিলো তাই সেদিন মেয়েকে মারলো । ওর স্ত্রী আদিবা, পুলিশকে বলে যে মেয়েটা অভিমানী কাজেই ওর কথা শুনো না । কিন্তু এইদেশে বাচ্চার গায়ে হাত তোলা মস্ত বড় অপরাধ । তাই ভীমা প্রায় জেলে চলে যাচ্ছিলো ।

=====

মধ্যবয়সী জিলিয়ান কাজ করে একটি সুপার মার্কেটে । একটাই ছেলে । জীবনে মাত্র তিনবার সেক্স করেছে তিনজনের সাথে । এক বয়ফ্রেন্ড, এক স্বামী ও শেষে এক পার্টনার । বিদেশে সবাই মাল্টিপেল পার্টনার রাখেনা । জিলিয়ানকে ওর স্বামী খুব মারতো তাই বিচ্ছেদ হয়ে যায় । নচেৎ ও লেগে থাকতো । বয়ফ্রেন্ড ছিলো মোহ । তাই বয়স বাড়তেই সেও সরে গেছে । পার্টনার এর সাথে ভালোবাসা কোনোদিনই ছিলো না । পুরোটাই একটা বোঝাপড়া ।তাই একদিন ওরা স্থির করে নিজ নিজ জীবন নিয়ে এগিয়ে যাবে । দুজনেরই স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার আছে ।

ছেলে এখনও মায়ের সাথে থাকে । ওর কোনো পার্টনার নেই । আগে ছিলো । সে মারা গেছে । কার ক্র্যাশে । নতুন কেউ আসেনি ।

ভীমার স্ত্রী আদিবার সারভাইক্যাল ক্যান্সার হল । এই রোগ নাকি মাল্টিপেল পার্টনার থেকে আসে । আদিবার কৈশোর থেকেই ভাব ভীমার সাথে । তাই ওকে কী করে এই অসুখ ধরলো অনেকেই জানতে চায় । কিন্তু জিলিয়ান বলে , এসব ঐ বজ্জাত ভীমার কীর্তি। ও নির্ঘাত ব্রথেলে গেছে আর এই অসুখের বীজ নিয়ে এসেছে ।

সেদিন সোনাঝরা সকালে মর্নিং ওয়াক করতে করতে হন্ হন্ করে এগিয়ে জিলিয়ান দেখতে পায় যে একটি শুকনো নালার মধ্যে কেউ অত্যন্ত নোংরা সব জিনিস ফেলে নালাকে প্রায় বোঝাই করে ফেলেছে । প্রবাসে

এইভাবে ময়লা ফেলা বেআইনি । জিলিয়ান তো জানে কে করেছে ! ভীমা । এও আবার বলে দিতে হবে নাকি ?

--ইউ ব্লাডি নিগার , ইউ ড্ডি্ থিস্ । আই নো । আই উইল কমপ্লেইন ! নালাটাকে চোক্ করে দিয়েছো একেবারে ! রেন্ ওয়াটার ফ্লো করবে কোনদিক দিয়ে ইউ ইডিয়ট্ ?

ভীমা যতই বলে সে এর সম্পর্কে কিছুই জানেনা মহিলা শুনবে না ।

ভীমা ভাবে সে ব্লাড্ ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত ডোনেট করে প্রমাণ করে দেবে যে সেও মানুষ । তার রক্তও লাল । কালো নয় ।

কিন্তু জিলিয়ান শোনার বান্দা নয় ।

বাড়ি ফিরে হৈ হৈ রৈ রৈ করার পরে জিলিয়ান লেটার বক্স খোলে । একটি সরকারি চিঠি এসেছে । ওর ছেলের নামে । হেথায় সেথায় ইলিগাল ডাম্পিং করার অপরাধে ওকে কোর্টের শমন পাঠিয়েছে । আগে ওকে নাকি ওয়ার্নিং দেয় কাউন্সিল । ও কেয়ার করেনি । ইদানিং নালায় ওকে অনেক ময়লা ফেলতে দেখেছে কেউ আর ওর সম্পর্কে নালিশ গেছে কাউন্সিলে । শুধু তাই নয় , পড়শীদের রিসাইকেল বিনেও নাকি সে রাতের আঁধারে গিয়ে নিজের ময়লা ফেলে আসে । অনেকে দেখেছে । তারাই পরে যৌথভাবে জানিয়েছে কাউন্সিলকে ।

চিঠিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে মেম বুড়ি জিলিয়ান ।

পর্দা ফাঁস হয়েছে এমনই যার জন্য সে প্রস্তুত ছিলোনা । সব শুনে আদিবা, ভীমাকে বলে , বাবা ও মায়েদের ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদের শেখানো উচিৎ যে সবাই সমান ও মানুষ । অন্য কোনো দেশ থেকে

ভাগ্যের সন্ধানে যারা আসে তারাও সুস্থ , সবল মানুষ । উন্মাদ বা অসভ্য নয়। কেবল তাদের সংস্কৃতিটা ভিন্ন । রক্তের রং লালই !!

শ্রীবিদ্যা

শ্রীবিদ্যা এক দ্রাবিড় শিশু । মাত্র আট বছর বয়স তার । তার পরিবার ছিলো দক্ষিণের মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারের মতন । পা ছুঁয়ে প্রণাম , বড়দের বিশেষ সম্মান দেওয়া ইত্যাদি ছিলো তার শিক্ষার মধ্যেই ।

শ্রীবিদ্যার মা একদিন খুন হয় । তারপরেই ওর বাবা রহস্যজনক ভাবে মারা যায় । হাইওয়ের উল্টো দিক থেকে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় হেড্ অন্ কলিশানে নিহত হয় । ইচ্ছাকৃত এই কান্ড ঘটার আগে একটি নোটে লিখে যায় যে স্ত্রী নিলোফারের মৃত্যু হয়েছে তারই হাতে । নিলোফারকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে, এক কোপে তার গলা কাটে ওর

স্বামী , শ্রীর বাবা রত্নম্ ।

সিডনি শহরে সকালে তিনজনে ম্যাকডোনাল্ডে বিগ ব্রেকফাস্ট খেয়ে বাসায় ফেরে । তারপর থেকেই ওর মা মানে সৎ মা নিলোফার নিঁখোজ । বাগানে একটি বিরাট গাছের কিছুটা অংশ কেটে সেখানে নিলুকে বসিয়ে কাঠ আবার আঁঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয় । পরে সেখান থেকে দেহ উদ্ধার হয় ।

সৎ মা হলেও শ্রীকে খুবই স্নেহ করতো নিলোফার । ওর বাবার প্রথম স্ত্রীর মেয়ে শ্রী । শিশুটি মাকে হারায় জন্মের সময় । তারপর থেকে নিলোফার ওকে মাতৃস্নেহ দেয় । কিন্তু হঠাৎ একদিন সে নিঁখোজ হলে পুলিশে খবর যায় ।

--আমার একটাই মেয়ে । ওকে ভালোভাবে মানুষ করতে চাই । আমাদের তো আর কেউ নেই । প্রায়ই বলতো রত্নম্ ।

শ্রী খুবই স্মার্ট মেয়ে । বুদ্ধিমতী ও দুষ্টু । দেখতেও মিষ্টি । মেয়েটি কোনোদিনই পুতুল খেলেনি । গড়পরতা মেয়েদের মতন । ও, ক্লে দিয়ে মূর্তি গড়তো । নানান মূর্তি । বাড়ির বাগানে চাষ করে অল্প সবজি ফলাতো । ও সবসময় বলতো যে ও বড় হয়ে আর্মিতে যাবে । আর্মি অফিসার হবে ।

--কম্ব্যাট্ ! দিস্ ইজ মাই ফেভারেট ওয়ার্ড । সেকেন্ড বেস্ট ওয়ার্ড ইজ্ ডেস্ট্রয় । ডেস্ট্রয় ইওর এনিমি !

প্রায়ই ঝগড়া হতো রত্নম্ আর নিলোফারের মধ্যে, ওকে নিয়ে । নিলু বলতো, এই এতটুকু এক শিশুকে এইসব না শেখানো উচিৎ । ওরা তো

ম্যাচিওর্ড্ নয় তাই উল্টোপাল্টা কিছু করে বসতে পারে । কিন্তু রত্নম্‌কে টলানো অসম্ভব মেয়ের ব্যাপারে । আলগা আহ্লাদ দেবার ক্ষেত্রে ওর জুড়ি নেই । নিলু বলে , মেয়েটাকে ও একদম নষ্ট করে দিচ্ছে । এত আশকারা দেওয়া ভালো নয় । এত কম্ব্যাট আর এনিমি দিয়ে ও করবে কি ?

সেদিন কোর্টে কেস বন্ধ হয়ে গেলো । কারণ কোনো অজানা কারণে স্ত্রীকে খুন করেছে রত্নম্ । মেয়েটি রয়েছে সরকারের কাছে । হয়ত ওর দায়িত্ব নেবে কোনো ফস্টার পেরেন্ট ! শিশুটির কথা ভাবলো না ওর বাবা ? স্ত্রীকে খুন করে ডেলিবারেট ক্র্যাশে গেলো ? মরেই গেলো ?

এদিকে শ্রীর দিনকাটে নতুন বাবা মায়ের ছত্রছায়াতে । এরা এসেছে লাতিন আমেরিকা থেকে । গরীব দেশ থেকে । লোকটি নাকি আগে ডাস্টবিনে ঢুকে খাবার খেতো । এখানে এসে চৈনিক সব পেট্রল পাম্পে কাজ করে করে অনেক কামিয়েছে । হাড় কিপ্‌টে । কিন্তু একটি শিশুকে মানে শ্রীকে দত্তক নিয়েছে । সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেবার জন্য । ওলঞ্জ নামক এই ব্যাক্তির স্ত্রী একজন দয়ালু মানুষ । ওদের সন্তান নেই । হবেও না কোনোদিন । তাই এই ব্যবস্থা ।

শ্রীবিদ্যা এখন আরো তুখোড় । এক কোপে গলা কাটা শিখেছিলো সিনেমা দেখে । এখন আন্তর্জাল থেকে কপি করেছে পশু মারার কায়দা ।

শুধু এবার কোনো পুরুষকে মারবে । মহিলা মারা তো হয়ে গেছে ! সেই কম্ব্যাট আর এনিমি ! মা ওকে সেদিন বকলো কেন ? এনিমি ! ও এনিমি !

আর বেচারি বুদ্ধু বাবা মানে রত্নম্ নাকি ওকেই বাঁচাতে গিয়ে মোটর গাড়ি নিয়ে আত্মহত্যা করেছে । শ্রীবিদ্যার সাথে আলোচনা করলে ও শিখিয়ে দিতো বাবাকে কী করে মিথ্যা বলে পার পেতে হয় যা নাকি ও চল্লচিত্র থেকে রপ্ত করেছে ।

আর বোকা বাবাটা ওকে কিনা বলে গেলো, কাউকে বলোনা যে মাম্মির ড্রিংকে ঘুমের ওষুধ মিলিয়ে তুমি, ঘুমন্ত অবস্থায় এক কোপে ওর গলার নালি কেটে দিয়েছো আর এসব রপ্ত করেছো সিনেমা দেখে ।

==========

ENDENDENDENDENDENDENDEND